লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১৩ শাবান, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ ওয়াফা, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০১১ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

দি পোর্টল্যান্ড রিজওয়ান মস্ক, পোর্টল্যান্ড, ইউ.এস.এ.

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

স্বাগত মাহে রমযান

বছর ঘুরে আবার আসছে পবিত্র মাহে রমযান। সময়ের আবর্তনে প্রতি বছর মহান সাধনার ব্রত নিয়ে এ মাস আমাদের সামনে হাজির হয় এক নব আনন্দ ও উদ্দীপনা নিয়ে। এ মাস মানবাত্মায় সারা বছরের পুঞ্জিভূত পাপ-পঙ্কিলতাকে ধুয়ে মুছে পরিশুদ্ধ করার উত্তম মাস। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও হৃদয়ে রূহানীয়াত ও আধ্যাত্মিকতার সুশীতল বায়ু বইয়ে দেয়ার জন্য পবিত্র এ মাস বার বার আমাদের মাঝে এসে হাজির হয়।

আর এই পবিত্র মাহে রমযান পবিত্র কুরআনের নূরে আলোকিত হবার মাস, বেহেশ্‌তী স্পন্দনে আলোড়িত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অন্বেষণে নব উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ার মাস। মহান খোদা আমাদেরকে আবারও একটি পবিত্র মাহে রমযান লাভ করার সৌভাগ্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

যেহেতু এ পবিত্র রমযান মাস খোদাকে সবচেয়ে কাছে ও একান্ত নিজের মত করে পাবার মাস তাই এ মাসের ইবাদত খোদার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর এ মাসের ইবাদত খোদা তাআলার কাছে এতই প্রিয় যে, বান্দার এ মাসের ইবাদতের প্রতিদান খোদা তাআলা নিজেই হয়ে যান। আর আমাদের নবী করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, মানুষ যত কাজ করে তা নিজের জন্য আর রোযা রাখা হয় আমার জন্য। সুতরাং আমি নিজেই এর পুরস্কার।

তাই আমাদের চিন্তা করা উচিত রোযা এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্। কোন কর্মের বিনিময়ে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় তাহলে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? আর এমনই এক মহান মাস আর ক'দিন পরই আমরা লাভ করতে যাচ্ছি। আর এ মহান মাসকে লাভ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যে ক'টি দিন অবশিষ্ট রয়েছে অযথা হেলায় ফেলায় নষ্ট না করে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানি, হযরত রাসূল করীম (সা.)-ও সাবান মাসের ১৫ তারিখ থেকে রমযানের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করতেন।

এ মাস যেহেতু পবিত্র ও মহা বরকত এবং কল্যাণের মাস এ কারণে একজন মানুষ এ মহান মাসে তার নফল ইবাদতগুলো যদি সুন্দর ভাবে পালন করে আর সমস্ত নেক আমল যদি আরো বাড়িয়ে দেয় তাহলে অতি সহজেই আমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হতে পারি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-ও এ সুযোগকে খুবই ভালভাবে কাজে লাগাতেন। এ মাসে তাঁর (সা.) ইবাদতের গতি খুবই বেড়ে যেতো (অন্য মাসের তুলনায়), দানের হাত ঝড়ো বেগে প্রসারিত হতো। আমরা রাসূল করীম (সা.)-এর উম্মত, তাঁর প্রকৃত অনুসারী। তাই আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে আগত এ পবিত্র রমযান মাসে নেকীর এ রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা করুন, আমরা যেন সুস্থতার সহিত পুরো মাস রোযা রেখে এবং বেশী বেশী নফল ইবাদত করে এ পবিত্র রমযান মাস অতিবাহিত করতে পারি। সেই সাথে পবিত্র কুরআন পাঠসহ দান খয়রাত ও সকল নেক আমলের সমন্বয়ে নিজেদের মাঝে এক অভিনব পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।

আগত এই রমযান সবার জন্য বয়ে আনুক অনেক অনেক কল্যাণ ও বরকত।

১৫ জুলাই ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১৩ মে ২০১১ইং এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
১৯ নভেম্বর ২০১০ইং এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১২
হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.) মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৮
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ডেস্ক **প্রিন্স এডওয়ার্ড কর্তৃক লন্ডনের প্রাচীনতম মসজিদ পরিদর্শন**	২০
প্রিয় বন্ধু সুজন! কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	২৩
পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫
সদাচার একটি মহৎগুণ মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৬
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৮
জলসা- ইজতেমার বরকত **ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা** **ফরিদ আহমদ,** Chino, California, U.S.A	৩০
নবীনদের পাতা- **মসজিদ মোবারক-এর উদ্বোধন ও কিছু কথা** মোয়াযযেম আহমদ সানী	৩২
সংবাদ	৩৩
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১। অতএব সে যখন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তাদেরকে (বিদায়ের জন্য) প্রস্তুত করলো তখন সে (ভুলক্রমে) তার ভাইয়ের মালপত্রের মাঝে পানপাত্র রেখে[১৩৯৩] দিল। এরপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো, 'হে কাফেলার লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা চোর[১৩৯৪]।'

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) তাদের দিকে ফিরে বললো, 'তোমরা কি হারিয়েছ?'

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿۷۳﴾

৭৩। তারা বললো, আমরা শস্য মাপার শাহীপাত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং যে-ই এটা (খুঁজে) নিয়ে আসবে তাকে (পুরস্কারস্বরূপ) এক উট বোঝাই (খাদ্যশস্য) দেয়া হবে। আর আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি। *

১৩৯৩। 'জায়ালা' শব্দের অর্থ 'রাখলো'। এটি এই অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে যে ইউসুফ (আ.) নিজেই পেয়ালাটি তার ভাইয়ের থলের মধ্যে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে তার সফরে সেটা ব্যবহার করতে পারে, অথবা পেয়ালাটি হয়তোবা ঘটনাক্রমে ইউসুফের অজান্তে বেনজামিনের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

১৩৯৪। এরূপ বললে ভুল হবে যে ইউসুফ (আ.) নিজেই তাঁর ভাইদের থলেতে পেয়ালাটি রাখার নির্দেশ দিয়ে পরে তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। এইরূপ কর্ম ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটি পানপাত্র ছিল (সিকাইয়াহ) যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইয়ের থলিতে রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ রাজকীয় ঘোষণাকারীর প্রচারানুযায়ী যা হারিয়েছিল তা ছিল 'সুওয়া'আ' অর্থাৎ পরিমাপ করার পাত্র, পান-পাত্র নয়। মনে হয় বহু বছরের বিচ্ছেদ অবসানের স্বল্পকালের সাক্ষাৎ শেষে ভাইদের ফিরতি সফরের প্রস্তুতি পর্বে সাহায্য করার উত্তেজনায় এবং ভাই বেনজামিনের আশু বিদায় ও বিয়োগ-ব্যাথায় হযরত ইউসুফ (আ.) পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলেন। রাজকীয় পরিমাপ-পাত্রে তাঁর জন্য পানি আনা হয়েছিল। এই জাতীয় পাত্র সেই যুগে পরিমাপ এবং পানীয় পান করার উভয় কাজেই ব্যবহৃত হতো। পিপাসা নিবারণ করার পর ইউসুফ (আ.) অন্যমনস্কভাবে পাত্রটি বেনজামিনের মালপত্রের মধ্যেই রেখেছিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে ও অজান্তে তাঁর ভাইয়ের মাল-পত্রের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন, কি প্রকারে এটি ঘটেছিল। কিন্তু তিনি মনে করলেন, আদ্যোপান্ত ঘটনাটি আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে–হয়ত বেনজামিনের পিছনে থেকে যাওয়ার জন্যই। এটা ভেবে তিনি পরিণামদর্শী বিজ্ঞের মতই মরু যাত্রীদের দল বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নীরব রইলেন।

* [শাহী পাত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে রাখা হয়নি বরং ভুলক্রমে এমনটি হয়েছিল। নতুবা আল্লাহ্ তাআলা একথা বলতেন না 'আমরা এভাবেই ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম।' এ পরিকল্পনা যদি ইউসুফের নিজেরই হয়ে থাকতো তাহলে আল্লাহ্ ঘটনাটিকে নিজের প্রতি আরোপ করতেন না। [(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমের প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

হাদীস শরীফ

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত

কুরআন :

আর তাদের পরে যারা এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর) যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।' (সূরা আল্ হাশর : ১১)

হাদীস :

হযরত আবু দারদা (রা.) হ'তে বর্ণিত হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া তার জন্য কবুল হয়।

ব্যাখ্যা : ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনদের কল্যাণের জন্যও যেন দোয়া করে। প্রথমত: দোয়া হৃদয়ের গহীন হতে সৃষ্ট ব্যাকুলতার নাম। অপরজনের দু:খ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাকে আপন মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম জায়গা করে নেয়। ইসলাম শুধু কোন এক ব্যক্তির মুক্তির কথাই বলে না বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ননা করা হয়েছে। আঁ-হুযূর (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য খোদামুখী হওয়াও হেদায়াত পাওয়ার বাসনা পোষণ ও তার কল্যাণমন্ডিত হবার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে সেখানে আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে উদাসীন শ্রেণী! তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিয়মের মাঝে ব্যতিক্রম দেখাতে চাও? অতএব চিন্তা করে দেখ। তবে তুমি চিন্তা-ভাবনা কর বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য পথভ্রষ্টদের হেদায়াত দাতা আমার প্রভু পথ দেখাতে চাইলে সে কথা ভিন্ন।

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষন ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুনা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে কি জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনা।

আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধিতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে।

বন্য পশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমির কিছুই অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপ্‌চে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ তাআলা এ যুগে খ্রিস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। তারা সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রিস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সির্‌রুল খিলাফাহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

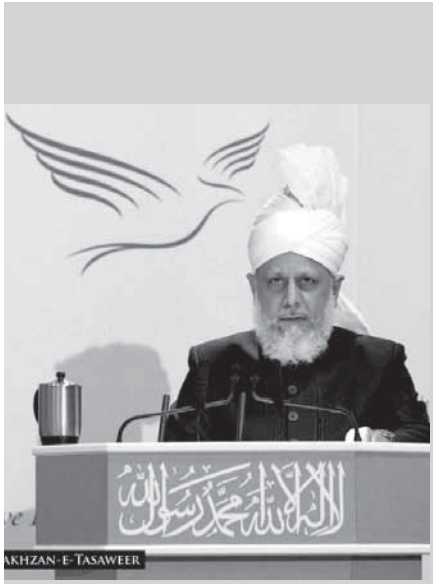

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৩ মে, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনওয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় পুস্তক "নযুলুল্ মসীহ্তে" বলেন,

"খোদা শুরু থেকে লিখে রেখেছেন আর নিজের নিয়ম এবং রীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রাসূল সর্বদা বিজয়ী হবেন। তাই, যেহেতু আমি তাঁর রাসূল অর্থাৎ প্রেরিত তবে নতুন কোন নাম, দাবী এবং শরিয়ত নিয়ে নয়। বরং সেই নবী করীম, খাতামাল আম্বিয়া (সা.)-এর নামে আখ্যায়িত হয়ে তারই মাঝে একীভূত হয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসেছি।

এ জন্য আমি বলছি, যেভাবে আদি থেকে অর্থাৎ আদম-এর যুগ থেকে নিয়ে আঁ-হযরত (সা.) পর্যন্ত সব সময় এ আয়াতের মর্ম সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে এখন আমার সমর্থনেও সত্য প্রমাণিত হবে।" (নযুলুল্ মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮০-৩৮১)

এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন সেটি হচ্ছে সূরা মুজাদেলার এ আয়াত,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

(সূরা মুজাদেলা :২২)

কিছু দিন হ'ল পাকিস্তান থেকে কেউ আমাকে লিখেছে যদিও আমি সেই লেখকের সাথে এক মত নই, কেননা লেখক যেভাবে চিত্র অংকন করেছেন, আমার দৃষ্টিতে এ বিষয়টিকে এমন সাধারণ রূপ দেয়া ঠিক নয়। লেখক লেখেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্র নবী, এ বিষয়টিকে জামা'তের সাহিত্য এবং প্রচার মাধ্যমে অনেক বেশি পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

কেননা মানুষ তাঁকে নবী বলতে সংকোচ বোধ করে। (হুযূর বলেন) আমার দৃষ্টিতে এটি জামা'তের সদস্যদের সম্পর্কে কু-ধারণা। কেননা এটাকে সাধারণ রূপ দেয়া ঠিক নয়। হতে পারে সেই লেখকের সাথে উঠা-বসাকারীরা বিশ্বাসের পরিপন্থী কিছু প্রদর্শন করে থাকতে পারে। তবে তারা তো সেই কতক মানুষ যাদের উপর বৈষয়িকতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকেন। তারা কখনো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশসমূহ দেখেন নি, পড়েন নি বরং আমার খুতবা সমূহও শুনেন না। কেননা আমি তো চেষ্টা করে থাকি কোন না কোন ভাবে কথা থেকে কথা বের করে আর বিষয় থেকে বিষয় বের করে তাঁর মর্যাদা স্পষ্ট করার।

যাই হউক যদি কারো হৃদয়ে এ ধারণা থাকে তবে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আহমদী বলে, এটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্র নবী। পৃথিবীর যে কোন অংশে অবস্থানকারী ব্যক্তি, যিনি নিজেকে আহমদী বলেন তার হৃদয়ে এ বিষয়ে সংশয় থাকলে সেটিকে দূরীভূত করা উচিত। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে এ উদ্ধৃতিতে বলেছেন, যা আমি পড়েছি যে, তিনি (আ.) আল্লাহ্ তাআলার রাসূল তবে কোন শরিয়ত ছাড়া আর খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর অনুসরণ ও তার নামে আখ্যায়িত হয়ে, কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী, 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাক্বুবিহীম' অনুযায়ী। (সূরা জুমুআ :৪)

পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ার আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তাদের তো নির্যাতনের চাকায় পিষ্ট এ জন্যই করা হচ্ছে যে, তারা (আহমদীরা) কেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী বলেন, নবী মনে করেন? তাই কদাচিত এক বা দু'জন বিশ্বাসের বিপরীত প্রদর্শনকারীর কারণে সাধারণভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের সম্পর্কে এটি বলাই যাবে না যে, তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী মনে করেন না।

বরং আমাদের বিরুদ্ধবাদী তো অতি রঞ্জিত করে আহমদীদের উপর এ মিথ্যা অভিযোগ দেয়, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে শেষ নবী মনে করি। অথচ কোন আহমদী কখনো এটি কল্পনাও করতে পারে না যে, আঁ-হযরত (সা.) ভিন্ন অন্য আর কেউ শেষ শরিয়তধারী নবী হতে পারে। আর তাঁর চেয়ে বড় আর কারো মর্যাদা হতে পারে। এটি হচ্ছে আঁ-হযরত (সা.)-এর মর্যাদা যা আহমদীরা বর্ণনা করে থাকেন আর প্রত্যেক আহমদীর ঈমানের অংগ।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সেই উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর মান্যকারীকে, তাঁর সাথে ভালবাসা প্রদর্শনকারীকে, সত্যিকার অর্থে আনুগত্যকারীকে আর যে উম্মতি হওয়াকে গৌরব মনে করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেছেন। যাই হোক আঁ-হযরত (সা.) খাতামান নবীঈন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁরই আনুগত্যে আল্লাহ্‌র নবী। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্‌র নবী না মান্য করি তাহলে আমাদের এ দাবীও ভুল হবে যে, ইসলামের পূর্ণ জীবন এবং ইসলামের বিজয় আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্যিকার ইসলামের মাধ্যমে হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার বিজয়ের ওয়াদা রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত, যেভাবে এ আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ওয়াদা কোন মোজাদ্দেদ বা মোসলেহ্-এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামের শেষ যুগে বিজয়ের ওয়াদা মুসলমানদের সেই জামা'তের সাথে যারা 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাক্বুবিহীম' সূরা জুমুআর সত্যায়ণকারী হবে।

সেজন্যই আঁ হযরত (সা.) মু'মিনদের তাগিদ দিয়েছিলেন আর এ নসীহত করেছিলেন যে, যখন মসীহ্ মাহ্‌দী প্রকাশিত হবে তখন যদি বরফের টুকরোর উপর দিয়েও যেতে হয় তবু যাবে আর গিয়ে আমার সালাম পৌঁছাবে। এ কারণে যে, এর মাধ্যমে নিজের ঈমানকেও মজবুত করবে আর ইসলামের বিজয়ের শেষ যে যুদ্ধ হওয়ার আছে যা তলোয়ার বা কামানের মাধ্যমে হবে না বরং দলিল এবং যুক্তির মাধ্যমে হবে সেটিতে অংশগ্রহণ করে আমর সত্যিকার অনুসরণকারী সাব্যস্ত হবে উপরন্তু আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাবে। সত্যিকার মু'মিন আখ্যা লাভকারী হয়ে যাবে।

সুতরাং আহমদী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর এ জন্য ঈমান এনেছে যেন তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা আল্লাহ্ এবং রাসূল (সা.)-এর উপর ঈমানে আরও পাকা হতে পারি আর ইসলামের বিজয়ের দৃশ্যও দেখি।

অত:পর এটিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নবী নন তাহলে খিলাফতও নেই। কেননা খিলাফতের সম্পর্ক নবুওয়াতের সাথে, খিলাফত 'মিনহাজিন নবুওয়াত' (নবুওয়াতের পদ্ধতিতে) চলার কথা। তিনি (আ.) খাতামুল খোলাফা আর এ খাতামুল খোলাফা হওয়ার কারণে তিনি নবীর মর্যাদা পেয়েছেন আর এরপর তাঁর মাধ্যমে খিলাফতের ধারা শুরু হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি ধারা যা এ জামা'তে আহমদীয়ার খিলাফতের ব্যবস্থা, এটির সম্পর্ক এ অবস্থাতেই হতে পারে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী স্বীকার করব, মানব এবং বিশ্বাস করব।

একদা কতক মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের জন্য উপস্থিত হলে তিনি তাদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য কতক বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেন। যার সারাংশ এই, তিনি বলেন, "কেবল মৌখিক তওবার বয়আত যেন না হয় বরং হৃদয়ের স্বীকৃতি যেন থাকে। যখন এমনটি হবে তখন খোদা তাআলার ওয়াদাগুলো পূর্ণ হওয়ার দৃশ্যও অবলোকন করবে। বয়আতকারী চায় (আর প্রকৃত পক্ষে ইচ্ছা পোষণ করে) যেন সে বয়আত করে নিজের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সমূহ সৃষ্টি করে। বর্তমানেও বয়আতকারীগণ এ দৃশ্য দেখে থাকেন, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে থাকেন, কতক বয়আতকারী নিজেদের পত্রে এটি বর্ণনাও করেন বরং একটি পবিত্র পরিবর্তন যা তাদের মধ্যে সাধিত হয় তা অন্যরাও দেখে সেটিকে অনুভব করতে থাকে। স্ত্রী-সন্তানগণ আশ্চর্যান্বিত হন যে, ইনি কি ছিলেন, আর এখন কি হয়ে গেছেন? এটা কি পরিবর্তন যা তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে? সুতরাং এটি হল প্রকৃত বয়আত যা এ ধরণের পবিত্র পরিবর্তন সমূহ সাধন করে।

অত:পর তিনি বয়আতকারীদের এ উপদেশও দেন যে, নিজের বয়আতকে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যের সাথে শর্তযুক্ত করবে না বরং নিজের কর্মে উন্নত ভাব সৃষ্টি কর তারপর দেখ, আল্লাহ্ তাআলা পুরস্কার এবং প্রতিদান বিহীন রাখেন না। অত:পর তিনি বলেন, বয়আত করে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। কষ্ট এসে থাকে কিন্তু প্রকৃত মু'মিন ধীরে ধীরে শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে, কেননা আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে, আমি এবং আমার রাসূল বিজয়ী হব। (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৯-২২১ থেকে সংগৃহীত)

অত:পর তিনি এটিও বলেন,

"আমাদের বিজয় লাভের অস্ত্র হচ্ছে ইস্তেগফার, তওবা, ধর্মীয় জ্ঞানের পরিচিতি, আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্বকে দৃষ্টিতে রাখা আর পাঁচ বেলার নামাযকে আদায় করা।" তিনি বলেন, "নামায দোয়া কবুলের চাবি, যখন নামায পড় তখন তাতে দোয়া কর আর অলসতা করবে না। প্রত্যেক প্রকারের মন্দ থেকে বাঁচ, হোক সেটা আল্লাহ্‌র অধিকার সম্বন্ধীয় বা সৃষ্টির অধিকার সম্বন্ধীয়। (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২২১-২২২)

সুতরাং এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এ উপদেশগুলো শুধু কেবল নতুন আহমদীদের জন্য ছিল না যারা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন বা আজ যারা নতুন বয়আত করেছেন তাদেরই জন্য বরং এ উপদেশাবলী প্রত্যেক আহমদীর জন্য। আহমদী যত পুরনো হবে তাঁর ঈমানে তত বেশি উন্নতি করা উচিত। নতুন আগমনকারীদের তুলনায় এ বিষয়গুলোতে তাদের (পুরনোদের) বেশি আমল করার চেষ্টা করা উচিত।

ইস্তেগফার কি? নিজের পূর্বেরও পরের পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসা যাতে পাপ থেকে রক্ষাও পায়। তওবা হচ্ছে, যে মন্দ কার্যাদিতে পড়ে আছে সেগুলোকে ঘৃণা করে সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার পাকা, মজবুত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা। অত:পর এ সংকল্পে আল্লাহ্ তাআলা থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে কাজে লেগে যাওয়া, কোন বিষয় যেন তাকে হটাতে না পারে। অত:পর ধর্মীয় জ্ঞানের পরিচয়, এতে সর্বাগ্রে রয়েছে কুরআন করীম, অত:পর কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের আলোকে এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা-বার্তা, তাঁর পুস্তকাদি, তাঁর বিভিন্ন লিখনীসমূহ এবং নির্দেশাবলী যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রাধান্যকে বিশ্বে দলিল ও যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। যার সম্মুখে অন্য কোন ধর্ম দাঁড়াতে পারে না কেননা ইসলামই শেষ, পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গীন ধর্ম।

অত:পর খোদা তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, যদি খোদা তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্টিপটে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, এ বিশ্বাস এবং ঈমান যেন থাকে যে, আল্লাহ্ তাআলাই সেই সত্ত্বা

যিনি সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আর সমস্ত প্রয়োজনাদি নিবারনকারী। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণাঙ্গীন জ্ঞান সেটিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তিনি আমাদের প্রতিপালক, জীবন ও মৃত্যুর অবতরণও তাঁরই হতে আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি সব জায়গায় বিরাজমান আর প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাদের দেখছেন। তাহলে কখনো কোন ব্যক্তি এমন কাজ করতে পারে না যা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং ইচ্ছার বিরোধী।

যখন আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন নিজে নিজেই পাঁচ বেলা নামাযের দিকেও দৃষ্টি থাকবে, দোয়ার দিকেও দৃষ্টি সৃষ্টি হতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদাসমূহ পূর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে, খোদা তাআলার সাথে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের কারণে বিশ্বাস বাড়তে থাকবে বরং এতে দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে থাকবে। নামায সম্পর্কে বলেছেন, এটি সমস্ত দোয়ার চাবি, নামাযই হচ্ছে সেই আসল দোয়া যা খোদা তাআলার নৈকট্য দান করে। খোদা তাআলার সাথে বান্দার জীবিত সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তাই নামাযগুলোকে সুসজ্জিত করে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার কুরআনী শিক্ষাও রয়েছে আর আঁ-হযরত (সা.)-ও নিজ উম্মতকে বিশেষভাবে এদিকে তাগিদ দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এতে অনেক জোর দিয়েছেন। তাই মানুষ যখন এ বিষয়গুলোর উপর আমল করবে তখন আল্লাহ্‌র অধিকার আদায়ের দিকেও দৃষ্টি থাকবে আর বান্দার অধিকার আদায়ের দিকেও দৃষ্টি থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা যদি নিজেদের মাঝে এ পরিবর্তন সৃষ্টি করে নাও তাহলে সেই বিজয়ে তোমরাও অংশীদার হয়ে যাবে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেরণার সাথে নির্দিষ্ট আর যার নিয়তি তারই সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় দান করবেন। কিন্তু তিনি (আ.) আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের বিজয় লাভের অস্ত্র হচ্ছে এ সকল বিষয়, তোমরা যদি এ বিষয়গুলোকে অবলম্বন কর তা হলে বিজয়ে তোমরাও অংশীদার হয়ে যাবে। নতুবা নামে তো আহমদী হবে কর্মে নয়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে সেই কর্ম সম্পাদনকারী আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিজয়ের পরিকল্পনার অংশ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনেক জায়গায় এ বিজয়ের শুভ সংবাদ দিয়েছেন। উদিত প্রত্যেক দিনে জামা'তে যা হচ্ছে, আমরা সেই শুভ সংবাদগুলোকে পূর্ণ হতে দেখছি। যত শক্তি দিয়ে জামা'তের বিরোধিতা করা হচ্ছে এটি যদি কোন মানুষের কাজ হত তা হলে এক পাও অগ্রসর হওয়া দূরের কথা বরং এক মুহূর্তও জীবিত থাকা কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা আছে এ জন্য সমস্ত বাধা, বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'ত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইলহাম সমূহের মাধ্যমে এই উন্নতির শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন।

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ তাআলার শুভ সংবাদগুলো সম্পূর্ণ সত্য আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের ভাগ্যে বিজয় সুনিশ্চিত। তবে আল্লাহ্ তাআলা যখন শুভ সংবাদ দেন তখন মান্যকারীদের উপরও কতক দায়িত্বাবলী অর্পিত হয়। তাদেরও কিছু কর্তব্য বর্তায় যা আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-২৬০, চতুর্থ মুদ্রণ, রাবওয়া)

নিশ্চিতভাবে এ কাজ খোদা তাআলাই সম্পাদন করছেন। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তাআলা এমটিএ-কে সেটির একটি মাধ্যম বানিয়েছেন, অনেক বড় মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার সংবাদ এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে, এমটিএ-এর হক আদায় করছে। কিন্তু আমরা এমটিএ-এর মেশিন লাগিয়ে যদি নিশ্চিন্তে বসে থাকি, কোন কাজ না করি, প্রোগ্রাম তৈরী না করি, রেকর্ডিং না হয়, বিভিন্ন ধরণের তবলিগী যে প্রোগ্রাম রয়েছে তা যদি না হয় তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যে মাধ্যম দান করেছেন, সেটার ব্যবহার না করে আমরা নিজেদেরকে এটি থেকে বঞ্চিত রাখব। আর আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যা দান করেছেন সেটি থেকে কল্যাণ লাভ করব না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে সাহিত্য সরবরাহ করেছেন সেটি থেকে উপকৃত হয়ে যদি সম্মুখে পৌঁছানো না হয়, সেটিকে ছড়ানো না হয় তা হলে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করলাম না অত:পর গুনাহগার হব। আল্লাহ্ তাআলা তো এ কাজ করবেনই আমাদের দ্বারা না হলে অন্য কোন মাধ্যমে করবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যে মাধ্যমগুলো সরবরাহ করেছেন আমরা যদি সেগুলোকে ব্যবহার না করি তা হলে এর অর্থ হচ্ছে আমরা গুনাহগার। পৃথিবীতে কখনও এমনটি হয়নি যে, নবী অথবা তাঁর জামা'ত আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদার পর সব কাজ ছেড়ে দিয়েছে আর হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।

আঁ-হযরত (সা.) অপেক্ষা আর কে আল্লাহ্ তাআলার বেশি প্রিয় হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁকে রোম ও ইরান বিজয়ের শুভ সংবাদ দেন তখন তাঁর সাহাবাগণের চেষ্টাও করতে হয়েছিল, কুরবানীও দিতে হয়েছিল। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের নগণ্য মনে করে পদদলিত করতে চাইল। দৃশ্যত: বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে নগণ্য লোকেরা, আঁ-হযরত (সা.)-এর সাহাবীগণ ঈমানের সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলেন, তওবা ইস্তেগফারকারী ছিলেন, নামাযকে এত সুন্দরভাবে আদায়কারী ছিলেন যে, তাদের প্রতি ঈর্ষা হয়, তারা আল্লাহ্ তাআলার সম্মানকে হৃদয়ে বসিয়েছিলেন, পার্থিব শান শওকত আর বাদশাহতের উচ্চ পদ ও মর্যাদা তাদের সম্মুখে কোন মূল্য রাখত না। তারা আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদাকে পূর্ণ করার জন্য নিজের দায়িত্ব পালন করে রোম ও ইরানের প্রাসাদকে প্রকম্পিত করে দিয়েছিলেন, তাদের রাজত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। পরিশ্রম করে, কুরবানী দিয়ে এগুলো লাভ হয়েছিল। বিশ্বাস আর ঈমানই তাদের মাঝে এই ঈমানী দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল।

নি:সন্দেহে জাগতিক উচ্চ পদ ও মর্যাদা আর শক্তি বাদশাহদের নিকট ছিল, সংখ্যাধিক্যও তাদেরই ছিল তথাপি এ সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। কেননা এটি লাভ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা রয়েছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আর এর ফলে আল্লাহ্

তাআলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। সুতরাং এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা পূর্ণ হওয়ার ছিল আর হয়েছে তথাপি তাদের এ চেষ্টা ছিল, আমাদের হাত দিয়ে যদি এটি পূর্ণ হয় তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাব।

অতএব আজ আমাদের এ অবস্থাই হওয়া উচিত। আমাদের এ বিষয়ে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমরা যদি এ ওয়াদাগুলো পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের সামান্য চেষ্টা মিলিয়ে নেই, আমরা যদি নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্বকে বুঝে নেই তা হলে আমরা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাবো। প্রত্যেক আহমদীকে এবং কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব বুঝার আর এর উপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কতক ভবিষ্যদ্বাণীও আপনাদের সম্মুখে রাখছি। অগণিত সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন-এ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হে মানবমন্ডলী! শুনে রাখ! তিনি বলেন, "এটি তার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এ জামা'তকে সকল দেশে বিস্তৃতি দান করে দিবেন এবং দলিল প্রমাণ দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। ঐ দিন আসছে এবং ঐ দিন সন্নিকটে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই একটি ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্ম এবং এই জামা'তকে উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ আশিসে ভূষিত করবেন এবং যে কেউ একে শেষ করে দেয়ার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া হবে। এ বিজয় স্থায়ীভাবে থাকবে। এমনকি কিয়ামত চলে আসবে।"

সুতরাং এটি হচ্ছে বিশ্বাস, যার প্রকাশ তিনি (আ.) করেছেন আর তিনি এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ বিশ্বাস এ কারণে যে, খোদা তাআলা যখন বলে দিয়েছেন, 'আমি এটি করব' তখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অবশ্যই তিনি করবেন। ইসলামের বিজয় এখন কেবল জামা'তে আহমদীয়ার মাধ্যমে হবে আর ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে। আমরা দেখছি আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করছেন আর প্রতি নিয়ত পূর্ণ করে চলছেন।

এই উদ্ধৃতিটি ১৯০৩ সালের, সে সময় যদিও হিন্দুস্থানের বাইরে জামা'তের পরিচিতি হয়েই গিয়েছিল তবু এটি বলা যাবে না যে, জামা'ত ছড়াচ্ছিল। কিন্তু আজ আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ১৯৮টি দেশে জামা'তের প্রতিনিধিত্ব বিদ্যমান রয়েছে আর পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে কোন না কোন ভাবে জামা'তের পরিচিতি পৌঁছে গিয়েছে। সুতরাং যে খোদা পৃথিবীতে আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সংবাদ পৌঁছিয়েছেন আর আজও পৌঁছাচ্ছেন তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য অংশটিও অবশ্যই পূর্ণ করবেন। কোথাও আহমদীয়াতের বিরোধিরা আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর কারণ হচ্ছে, তাদের বিরোধিতার কারণে পবিত্র আত্মাগুলো আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

বাহ্যত তারা লোকদের আহমদীয়াত থেকে দূরে সরানোর জন্য বিরোধিতা করছেন কিন্তু যারা পবিত্রচেতা মানুষ তাদের মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও আহমদীয়াতের ভালবাসা, আন্তরিকতার সংবাদ পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। কোথাও আমাদের অতি সাধারণ খেদমতে খালকের কাজ এবং বিনয় যা রয়েছে সেটির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি জামা'তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে আবার কোথাও স্বপ্ন এবং দিব্যদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত করাচ্ছেন আর বিশ্ব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে চিনছে। অত:পর যে দলিল সমূহ জামা'তে আহমদীয়ার নিকট আছে তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছেন, এ যুক্তি এবং দলিলসমূহ যখন এমটিএ-এর মাধ্যমে পৃথিবী দেখে তখন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আহমদীয়াতের শত্রুরা পরিপূর্ণ চেষ্টা করে যেন মানুষ এমটিএ না দেখে। বর্তমানে বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক ইসলামী দেশে মৌলভী আর তথাকথিত আলেমগণ মানুষকে এটি বলে যে, এমটিএ দেখবে না। এতে তোমার ঈমানের উপর আঘাত আসবে, নাউযুবিল্লাহ্, তোমরা তাদের কুফর এবং প্রতারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যাবে। কিন্তু যাদের নিকট সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তারা বলে এটি যদি ভুল হয়ে থাকে তা হলে দলিলের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত কর। বল পূর্বক নিষেধ করার অর্থই হচ্ছে, তোমাদের নিকট্ দলিল নেই আর ইসলামী শিক্ষা এমন নয় যে, বিবেক-বুদ্ধি এবং দলিল বিহীন কথা বলবে।

সুতরাং এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদাসমূহের পূর্ণ হওয়ার মর্যাদা, আল্লাহ্ তাআলা আঁ-হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পৃথিবীবাসীকে আঁ-হযরত (সা.)-এর পদতলে নিয়ে আসছেন, তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত করছেন। তাই প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, নিজের কর্তব্যকে বুঝা। এটি নয় যে, আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা আছে তাই (এমনিতে) পূর্ণ হয়ে যাবে, আমাদের (কষ্টের) প্রয়োজন কী? ওয়াদা যত বড়, শুভ সংবাদ যত বড় সেগুলোতে অংশীদার হওয়ার জন্য আমাদের দায়িত্বও তত বড়।

'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র প্রাপ্য) আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়ে অংশ নেওয়া উচিত। 'হুকুকুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার) প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের প্রত্যাশিত সমস্ত আশা আকাঙ্খা এবং প্রাধান্যকে ছেড়ে দিয়ে অংশগ্রহণ করা উচিত। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্য আমাদের নিজেদের শক্তি, জ্ঞান এবং চেষ্টাসমূহ প্রয়োগে অংশগ্রহণ অধিক থেকে অধিকতর করা উচিত। তাহলেই আমরা এই মহান পরিকল্পনা এবং কল্যাণসমূহ থেকে কল্যাণ লাভকারী হতে পারব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় শুভ সংবাদ দিয়ে বলেন, "লা তায়আসু মিন খাযায়েনে রাহমাতে রাব্বি, ইন্না আ'তায়নাকাল কাউসার"– অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভান্ডার থেকে নিরাশ হবে না, আমরা তোমাকে অত্যধিক কল্যাণ দান করেছি। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা নম্বর-৪৪০, চতুর্থ মুদ্রণ, রাবওয়া)

সুতরাং মুসলমান বা ইসলামের (দূর) অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে অস্থিরতা ছিল আল্লাহ্ তাআলা সেটিকে দূরীভূত করে এ সান্তনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভান্ডার থেকে নিরাশ হবে না, আমরা তোমাকে অত্যধিক কল্যাণ দিয়ে রেখেছি, তোমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.) যে অত্যধিক কল্যাণ লাভ করেছিলেন সেটি পরবর্তীদেরও তোমার মাধ্যমে লাভ

হচ্ছে এবং হবে। আঁ-হযরত (সা.)-এর কল্যাণের ঝর্ণা এখন পুণরায় তোমার মাধ্যমে জারী হয়ে গেছে। সুতরাং আনন্দিত হও এবং আনন্দে উদ্বেলিত হও যে, আল্লাহ্ তাআলা দয়ার ভান্ডার পুণরায় এক নতুন মর্যাদায় দরজা খুলে দিয়েছেন। যারা এ দরজাগুলো দিয়ে ভান্ডার লাভের জন্য প্রবেশ করবে তারা নিজেদেরকে সম্পদশালী করে নিবে।

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে যে, অস্থিরতা রয়েছে আর কতকের মাঝে ধর্মের সেবার অনুভূতিও রয়েছে, কতক (এ ব্যাপারে) সক্রিয়ও কিন্তু তারা পথ নির্দেশনা পাচ্ছে না, অত:পর নিরাশা ছেয়ে যায় অত:পর এ নিরাশা অস্থিরতাকে আরও বৃদ্ধি করে ভুল পথে পরিচালিত করে এমন লোকদের বুঝানো উচিত, আমাদের যারা তাদেরকে সংবাদ পৌঁছাতে পারি তাদের সংবাদ পৌঁছানো উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা পুণরায় কাউসারের ঝর্ণা নিজের প্রেরিত প্রেমাস্পদের প্রেমিক আর প্রকৃত প্রেমিক, যিনি অত্যাধিক ভালবাসার কারণে উম্মতী নবীর মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁর মাধ্যমে পুণরায় জারী করে দিয়েছেন।

সুতরাং যদি নিরাশাকে শেষ করতে হয় তাহলে এ মসীহ্ ও মাহ্দীর বাহুডোরে এসে তার সাথে চিমটে নিজের নিরাশাকে দূর কর, কেননা তিনিই আল্লাহ্ তাআলা সমর্থিত তোমরা যার অপেক্ষা করছ। চিন্তা কর এবং দেখ! সমস্ত শক্তিসমূহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আওয়াজকে স্তিমিত ও নি:শেষ করার জন্য একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। বিগত শত বছরেরও অধিক সময় ধরে একত্রিত হয়ে আছে কিন্তু এ আওয়াজকে কী স্তিমিত করা গেছে? যেভাবে পূর্বে আমি বলেছি যে, এ ধ্বনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃতি লাভ করছে আর অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের সমর্থনে ভূমিকম্পের নিদর্শনের বর্ণনা দিয়ে এক জায়গায় বলেন,

"স্মরণ রাখবে! এ নিদর্শনগুলোর পরই শেষ নয় বরং কতক নিদর্শন সমূহ একটির পর অপরটি প্রকাশ পেতে থাকবে সেই পর্যন্ত যে, মানুষের চোখ উন্মোচিত হবে এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে, কী ঘটতে যাচ্ছে? প্রত্যেক দিবস কঠিন এবং পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে। খোদা বলেন, আমি আশ্চর্যজনক কাজ প্রদর্শন করব আর শেষ করব না যতক্ষণ মানুষ নিজের হৃদয়গুলোকে সংশোধন না করে নেয়।" (মজমুআ' ইশতেহারাত, ২য় খন্ড, "আন্‌নিদা মিন্ ওহীস্ সামায়ে" পৃষ্ঠা ৬৩৮, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

বর্তমানে আমরা দেখছি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। পৃথিবী, বিজ্ঞানী বা বৈষয়িক লোকেরা যদি কিছুকাল পর পর আগত এ (দুর্যোগগুলোকে) কেবল একটি প্রাকৃতিক কর্ম মনে করে উপেক্ষা করতে থাকে আর নিজের সৃষ্টিকর্তা খোদার দিকে দৃষ্টি না দেয় তাহলে স্মরণ রেখ! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে এই দুর্যোগ এবং ভুমিকম্পসমূহের বড় গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ দুর্যোগ পৃথিবীকে নিজের করতলগত করতে থাকবে। তাই পৃথিবীকে সতর্ক করার জন্য প্রত্যেক আহমদীরও কর্তব্য, সে যেখানে নিজের সংশোধন এবং ঈমানের দৃঢ়তার প্রতি দৃষ্টি দিবে সেখানে এ সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

পৃথিবীকে খোদা তাআলার নিকটে আনার চেষ্টা করবে, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমাদের উপর সোপর্দ করা হয়েছে। জামা'তের পরিচয় যেখানে ভালবাসা, শান্তি এবং স্নেহের উদ্ধৃতিতে করিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে পরবর্তী সংবাদ হচ্ছে, এগুলো আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা, স্নেহ এবং শান্তির আওয়াজ যা আমাদের থেকে চায় যে, আমরা মানবতাকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করব। পৃথিবীকে খোদা তাআলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই আর আল্লাহ্ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে অবগত করি যেন তারা সেই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। যার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টির এ উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন সময়ে এ দুর্যোগসমূহ প্রেরণ করে থাকেন। মানুষ যদি দৃষ্টি না দেয় তবে এ দুর্যোগসমূহ আসতে থাকবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পৃথিবীকে সতর্ক করার এ কাজ আজ আমাদেরই, এটি জামা'তে আহমদীয়ারই কাজ। অন্য কেউ এটিকে সম্পাদন করার নেই। কেননা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেই আঁ-হযরত (সা.)-এর দাসত্বে সেই বিশেষ নৈকট্য ও স্নেহের মর্যাদা দান করেছেন। বরং আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এক ইলহামে আঁ-হযরত (সা.)-এর সন্তানের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি বলেন, "ইন্নি মাআ'কা ইয়াব্‌না রাসূলিল্লাহ্" অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তান আমি তোমার সাথে আছি।

সুতরাং তিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর সেই আধ্যাত্মিক সন্তান যিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর মিশনকে পূর্ণ করবেন আর এটি তাঁর মান্যকারীদেরও দায়িত্ব। যদি আল্লাহ্ তাআলার সাহচর্য লাভ করতে হয়, আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কারের অংশীদার হতে হয় তাহলে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে তবলীগের কাজ সম্পাদন করুন। যে প্রচন্ডতা আর অধিক সংখ্যায় বিগত বছরগুলোতে দুর্যোগ সমূহ এসেছে সেই প্রচন্ডতা এবং চেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীকে সতর্ক করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মুসলমানদের বুঝানো প্রয়োজন, কেননা এ ইলহামের সাথে অন্য যে ইলহাম রয়েছে সেটি হচ্ছে, সমস্ত মুসলমান যারা পৃথিবীতে বসবাস করছে তাদেরকে একত্রিত কর "আ'লা দ্বিনীন্ ওয়াহেদিন্"। (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

এটি যদিও সরাসরি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নির্দেশ এবং ইলহাম করা হয়েছিল, তাঁর কাজ ছিল যা তিনি করেছেন কিন্তু তাঁর মান্যকারীদেরও এটি কাজ, আমাদেরও এটি কাজ যে এ সংবাদকে পৌঁছাই। যদিও কতক মুসলমান দেশে আহমদীদের উপর প্রতিবন্ধকতা এবং কাঠিন্য রয়েছে, আমরা সংবাদ পৌঁছাতে পারি না। সাধারণ উন্মুক্ত (পরিবেশে) তবলীগ করতে পারি না তথাকথিত আলেমরা লোকদেরকে আমাদের পয়গাম শুনতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু একটি মাধ্যম বন্ধ হলে হিকমতের সাথে অন্য মাধ্যম অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক এলাকায় বন্ধ হলে, এক দেশে বন্ধ হলে অন্য দেশসমূহের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। যদি এই দেশগুলোতে আহমদীদের সরাসরি তবলীগ করার যদিও অনুমতি নাই তদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা এমটিএ-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অন্য সকল বাধা সত্ত্বেও

তবলীগের দাওয়াত পৌঁছাচ্ছে আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বয়আতও হচ্ছে। অত:পর কতক দেশ যেখানে আইনের এমন প্রতিবন্ধকতা তো নেই তবে কতক আলেমের পক্ষ থেকে বিরোধিতা হয়ে থাকে কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কতক এমন পবিত্রচেতা লোকও রয়েছেন যারা আমাদের মজলিসে এসে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্টও হচ্ছেন। এমন জায়গাসমূহে যেখানে আইনের প্রতিবন্ধকতা নেই আর মানুষের মাঝে কিছু আকর্ষনও সৃষ্টি হচ্ছে, এমন মুসলমান দেশগুলোতে বিশেষ করে আফ্রিকায় আমাদের চেষ্টা পূর্বের তুলনায় অধিক বেগবান করা উচিত, এটি প্রত্যেক জায়গায় জামা'তী ব্যবস্থাপনার কাজ। আফ্রিকার কতক দেশে (বয়আতের সময়) ইমামের সাথে তার মান্যকারীসহ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আর এটিও একটি ঐশী পরিকল্পনা।

আমাদের চেষ্টা তো নগণ্য আল্লাহ্ তাআলাই হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করছেন। এই যে ইলহাম-এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এই যে বিষয়, সমস্ত মুসলমান যারা পৃথিবীতে বসবাস করছে তাদেকে একত্রিত কর "আলা' দ্বিনীন্ ওয়াহেদিন্" এটি একটি বিশেষ ধরণের নির্দেশ। আদেশ ও নির্দেশ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে যেমন নামায পড়, যাকাত দাও, হত্যা করবে না ইত্যাদি এ ধরনের নির্দেশসমূহে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও থাকে যে কতক এমনও হবে যারা এটির বিপরীত করবে।"

এই যে নির্দেশ এটি নির্দেশ বটে কিন্তু এটি এমন নির্দেশ যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণীও লুক্কায়িত থাকে অর্থাৎ এমন মানুষ হবে যারা এটি করবে না। এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, কর। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "যেমন ইহুদীদের বলা হয়েছিল, তওরাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে না। এটি বলা হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কতক করবে। তদ্রূপ এমনটি হয়েছে। বস্তুত: এটি একটি শরিয়তের নির্দেশ আর এটি শরিয়তের পরিভাষা।"

তিনি বলেন, "দ্বিতীয় নির্দেশ জাতীয় হয়ে থাকে। আর এ আদেশ ও নির্দেশ তকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে যেমন

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۟

'আমরা বললাম, হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং ইব্রাহীমের জন্য শান্তির উৎস হয়ে যাও' (সূরা আম্বিয়া : ৭০)। আর সেটি তদ্রূপ ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। আর এই নির্দেশ যা আমার এ ইলহামে আছে এটিও সেই ধরনেরই মনে হয়। আল্লাহ্ তাআলা চান যেন পৃথিবীতে বসবাসকারী মুসলমান আলা' দ্বিনীন্ ওয়াহেদিন্ এক ধর্মে একত্রিত হয় আর এটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। এটির অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যে কোন ধরনের বিরোধিতাও থাকবে না। বিরোধিতাও থাকবে তবে সেটি এমন হবে যা বর্ণনার অযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য হবে না।" (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৭০)

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ ইলহামের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটি আমাদের শুভ সংবাদ দেয় যে, এ নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলার জাতীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যার সম্পর্কে খোদা তাআলা যখন কুন্ বলেন, (যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন আমি যখন কুন বলি তখন সেটি হয়ে যায়।) তাই এটি সেই নির্দেশ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা কুন বলে দিয়েছেন। কুন এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা কুন বললেন, আর তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে যখন ঘোষণা হয় তখন সেই সাথে হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। বরং প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যতটুকু সময় প্রয়োজন সেটি লাগবে। অথবা আল্লাহ্ তাআলার হিকমত অনুযায়ী যতটুকু সময় প্রয়োজন সেটি লাগবে। কিন্তু ফল অবশ্যই তার স্বপক্ষে প্রকাশিত হয়।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা যখন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কুন বলেন তখন ভিত্তি রচিত হয়ে যায়। তথাপি প্রত্যেক জানোয়ার বা মানুষ এর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'তে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যতটুকু সময় প্রয়োজন সেটি দরকার হয়ে থাকে। এটি হয় না যে, কুন (বলা) হল আর এক-দুই দিনে বা দুই মিনিটে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেল। যতটুকু সময় প্রয়োজন তা দরকার হয়। এগুলো আর এসব কিছুর যে ব্যবস্থা সেটি আল্লাহ্‌র কুন (হয়ে যাও) দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানেও কারো ভুল বুঝবার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তাআলার তকদীর এটি সিদ্ধান্ত করে রেখে দিয়েছে যে, মুসলমানগণ দ্বীনে ওয়াহেদে (এক ধর্মে) একত্রিত হবে।

সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্য থেকেও আর মুসলমানদের প্রত্যেক ফিরকা থেকেও মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এ কারণে এই চিন্তার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের মধ্যে ঐ মুসলমান কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন? (যখন কিনা) কতক মুসলমান দেশে আমাদের-আহমদীদের সাথে তৃতীয় সারির নাগরিকের আচরণ করা হয়। তাই সেই দেশের মুসলমান কীভাবে (এ জামা'তে) অন্তর্ভুক্ত হবেন? যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এটি আল্লাহ্ তাআলার তকদীর। এভাবে হবে আর ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে। নি:সন্দেহে আজ আমাদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে, আর মুসলমানদের পক্ষ থেকেই কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তবে ইনশাআল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই ভালবাসার বিন্দুসমূহ বর্ষিত হবে আর ইনশাআল্লাহ্ আমরা অবলোকন করব।

সুতরাং দুর্বল প্রকৃতির মানুষ যারা, তারাও এ বিশ্বাস ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকুন আর যাদের মধ্যে জাগতিকতা রয়েছে বা জাগতিকতা তাদেরকে কিছুটা ঘিরে রেখেছে তারাও এ কথাকে স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তাআলার তকদীর বিজয়ী হবে। এজন্য কোন কারণ নেই যে, কোথাও আমরা বিশ্বাসের বিপরীত প্রদর্শন করব, দুর্বলতা দেখাব বা লজ্জায় বা বিরোধিদের বিরোধিতায় চিন্তিত হব যে, আমরা যদি ঈমানের প্রকাশ করি তাহলে জানি না আমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে? এই কষ্ট তো হয়েই থাকে আর একজন মু'মিন তো এই কষ্টগুলোকে সুঁই ফোটার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না। এই সুঁই ফোটানোকারীদের থেকে ভীত হয়ে আমরা আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারি না।

আমরা আমাদের ঈমান গোপন করতে পারি না। পাকিস্তানের অধিকাংশ আহমদী বরং ৯৯.৯৯ শতাংশ আহমদী বিরোধিদের কঠিন তুফান সত্বেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করছে। পাকিস্তানের আহমদী, ইন্দোনেশীয়ার আহমদী এবং যেখানেই জামা'তের বিরুদ্ধে বিরোধীতার তুফান সৃষ্টি করা হয় সেখানে আহমদীদের কুরবানীই পৃথিবীতে নতুন নতুন তবলীগের পথও উন্মোচিত করছে।

ইনশাআল্লাহ্ তাআলা একদিন মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করেই উম্মতে ওয়াহেদা (এক উম্মত)-এর দৃশ্য উপস্থাপন করবে। এটি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, খোদা তাআলা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে অনেক সম্মান দান করবেন আর আমার ভালবাসা হৃদয়ে গেঁথে দেবেন।

আমার সিলসিলাকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিবেন আর সমস্ত ফিরকার উপর আমার ফিরকাকে বিজয়ী করবেন। আমার ফিরকার লোকেরা ইলম ও তত্ত্বজ্ঞানে এত ব্যাপক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে যে নিজেদের সত্যতার জ্যোতি, দলিল এবং নিদর্শনসমূহ দ্বারা সবাইকে নির্বাক করে দিবে। (তাজাল্লিয়াতে এলাহী, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা ৪০৯)

সুতরাং এটি অত্যন্ত শক্তিশালী শুভ সংবাদ যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় লাভের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং আমাদের কাজ, নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তাকে আরো বৃদ্ধি করতে থাকা, নিজেদের ইবাদতগুলোকে সুসজ্জিত করতে থাকা, নিজেদের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে বৃদ্ধি করতে থাকা আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের পূনর্জীবনের যে কাজ হওয়ার আছে এবং হচ্ছে তাতে তাঁর সহায়ক এবং সাহায্যকারী হতে থাকা যেন আমরা এবং আমাদের বংশধরগণ সব সময় আল্লাহ্ তাআলার ফযলকে একত্রিতকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এর তৌফিক দান করুন।

আজ জুমুআর নামাযের পর আমি কতক জানাযার নামায পড়াব।

একটি জানাযা আমেরিকার মোকাররম সাহেবযাদা রাশেদ লতীফ সাহেব রাশেদীর। যিনি লস এনজেলসে ২৭ শে এপ্রিল মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত শহীদ শাহ্‌যাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.) এর পৌত্র এবং সাহেবযাদা তৈয়্যব লতীফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বানুতে অর্জন করেন, তারপর লাহোরের তালীমুল ইসলাম কলেজে পড়েন, অত:পর তিনি আফগানিস্তানে চলে যান। কিছুদিন তিনি সেখানে থাকেন এবং জামাতের সাথে তার খুবই নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। তাঁর ঘরে জামাতের সদস্যরা এসে নামায পড়ত। তিনি ১৯৬৫তে আমেরিকায় পানিষ্ঠে চলে আসেন এবং সেখানে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন তারপর আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যান। আমেরিকার সিয়াটল (Seattle) জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। অনেক দিন কেলিফোর্ণিয়ায় ছিলেন। জামাতের সালানা জলসায় বক্তৃতাও করতেন। ২০০৫সালে কাদীয়ান জলসায় যান, সেখানেও তার বক্তৃতার সুযোগ হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে তিনি তাজকেরাতুশ শাহাদাতাঈন পুস্তক আফগানিস্তানের "দাররী" ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর স্ত্রী ছাড়া এক মেয়ে এবং দুই ছেলে রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হ'ল মোকাররম মুবারক মাহ্‌মুদ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা-এর। তিনি ৪ঠা মে অনেক দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৪২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না.....রাজেউন। তিনি ১৯৮৯ সালে জামেয়া পাশ করেন। ৯ বছর পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে মুরব্বীর দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর ১৯৯৮সালে তানযানিয়াতে যান। ৮ বছর তিনি সেখানে জামাতের খেদমত করেন। তানযানিয়াতে তার ক্যান্সার হয় এবং সেখান থেকে তিনি পাকিস্তান ফেরত আসেন। অত:পর তিনি সোহেলী ডেস্কে ওকালতে তাসনীফ এ কাজ করেন। অসুস্থতা সত্বেও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন। তিনি খুবই কষ্টদায়ক রোগে ভূগছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করেন। মুখ দিয়ে কখনো অকৃতজ্ঞতা এবং অধৈর্যের বহি:প্রকাশ ঘটেনি। তিনি সর্বদা সবার সাথে হাসি মুখ ও প্রফুল্লচিত্তে কথা বলতেন। মূসী ছিলেন। তার স্ত্রী এবং তিন মেয়ে ছাড়া বাবা-মা আর চার ভাইও রয়েছে। মরহুম মিরপুর খাস জেলার আমীর সাঈফ আলী শাহেদ সাহেবের পুত্র, মোবল্লেগ ইনচার্য জার্মানী হায়দার আলী জাফর সাহেবের ভাতিজা।

তৃতীয় জানাযা সীদওয়ালা, শেখূপুরার মোকাররম মিয়া মনওয়ার আহমদ সাহেবের ছেলে মোযাফ্‌ফর আহমদ সাহেবের। মোযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, ফরযানা জাবীন সাহেবা, স্নেহের আমাতুন নূর সাহেবা, ওলীদ আহমদ এবং তাসাভ্‌ভর আহমদ সম্পূর্ণ পরিবার মটর সাইকেলে চড়ে ফয়সালাবাদ থেকে চিনিউট আসছিলেন পথে দূর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার মৃত্যুবরণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার ছয় বছর, চার বছর এবং দুই বছরের তিন সন্তান ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ শো'বান আহমদ সাহেবের খানদানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, যিনি স্বপ্নের ফলশ্রুতিতে কাদীয়ান গিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব নিজেও খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ছিলেন। হালকার নেগরান আর নওমোবাঈন সেক্রেটারী হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ এবং সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ এবং নাযেম আতফাল হিসেবে খেদমত করে যাচ্ছিলেন। সহজ সরল কথা বলতে পছন্দ করতেন আর নিষ্ঠাবান ছিলেন। 'সীদওয়ালা' মসজিদ নির্মাণের সময়ও তিনি সেখানে তার টিমের সাথে বড় ভূমিকা রাখেন। কেননা যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল তাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পরবর্তীতে ঐ মসজিদকে শহীদ করা হয়েছে। ২০০১ সালে তিনি কিছু দিন আসীরানে রাহে মাওলাও ছিলেন। মূসী ছিলেন। দুই বোন এবং চার ভাই রেখে গিয়েছেন। স্ত্রীর দিকের আত্মীয়দের মধ্যে আছেন পিতা শেখ ফযল করীম সাহেব এবং ছয় বোন ও চার ভাই। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবাইকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং ক্ষমার ব্যবহার করুন।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**

শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

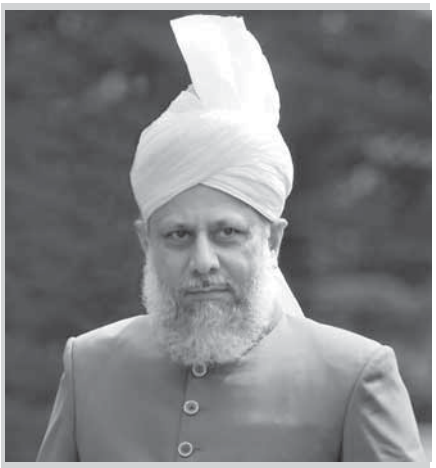

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৯ নভেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তা'উজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আই.) নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করেন-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٩﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٠﴾

(আল আনকাবুত ঃ ৫৯-৬০)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মু'মিনদের সেই জাতি সৃষ্টি করেছেন যারা ঈমানে অগ্রগামী ছিল। তাদের এ দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী। তার মাধ্যমে দ্বীন (ধর্ম) পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এ পরিপূর্ণ ধর্ম পালন করে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। সাহাবাগণ যখন ঈমানের চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছতে থাকেন তখন তাদের সব আচরণ, মনের প্রশান্তি এবং সব কাজ খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে গেল।

যে কাজ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় তাকেই আমলে সালেহ (সৎকাজ) বলা হয়। অতএব, এ আয়াত দু'টিতে ঐসব লোকদের উল্লেখ রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র করন শক্তির মাধ্যমে নিজেদের ভেতর এক মহা পরিবর্তন সাধন করেছেন। তারা নিজেদের পূর্বের সব মন্দ স্বভাব ত্যাগ করে এমন শক্তিশালী ঈমান লাভ করেছিল যে তারা প্রমান করে দিল, ঈমানে দৃঢ়তা লাভ ও সৎকাজ করার জন্য তারা বড় বড় ত্যাগ করতে প্রস্তুত। দুঃখ কষ্ট মুখবুজে সহ্য করতে হলে করবে। কেননা এক সময় যখন দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের অনুমতি ছিল না, তখন নীরবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করাই ছিল দৃঢ় ঈমানের দাবী। দুঃখ কষ্টের প্রতিশোধে উল্টো দুঃখ কষ্ট দেয়া যাবে না। এটাই তখন সৎকাজ ছিল। যখন আদেশ আসল যে মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত কর, তখন কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করে নিজ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াই ছিল দৃঢ় ঈমানের পরিচায়ক এবং সৎকাজ।

শত্রুকে শাস্তি দেয়ার জন্য যখন যুদ্ধের আদেশ আসে, তখন পরিনামের পরোয়া না করে শত্রুকে শাস্তি দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবী ও সৎকাজ। নিজের কাছে অস্ত্র আছে কি নেই, শত্রু শক্তির সাথে নিজেদের শক্তির সমতা আছে কি নেই তার পরোয়া নেই। মোটকথা, ঈমান আনার পর যখন সব সৎকাজ খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়, তখন মানুষ নিজ প্রানকে খোদা তাআলার আমানত ভাবতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবাগণ (রা.) এর হক আদায় করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এমন লোকদের আমি নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করাবো। জান্নাতে তারা এমন বালাখানা (সুরম্য ঘর) পাবে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। এ জান্নাত সমূহ অফুরন্ত কল্যানরাজী ও চির জীবনের স্থান। আল্লাহ তা'লা বলেন, পূর্ণ ঈমান অর্জনকারী এবং সব কাজ আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে সম্পাদনকারীদের জন্য আমরা এ সর্বোত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। যারা পুরস্কার স্বরূপ সর্বোত্তম ও চিরন্তন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়, এরা ঐসব লোক যারা চূড়ান্ত ধৈর্যের সাথে আত্মত্যাগ করেছে এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষা করেছে। তারা আপন প্রভূর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমরা যদি ধৈর্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নিজেদের ঈমানের সুরক্ষা করি এবং সব কাজ খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করতে থাকি, তবে অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই আমাদের পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রশিক্ষন ও পবিত্র করন শক্তির প্রভাবে সাহাবাদের (রা.) মধ্যে এ দৃঢ় ঈমান এবং সৎকাজের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

আজ আমি ধৈর্য সম্বন্ধে কিছু হাদীস উপস্থাপন করব যা থেকে জানা যাবে বিশ্বাসীদের মধ্যে এ সচ্চরিত্র সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং সাহাবাগণ (রা.) যারা দিন দিন ঈমানে উন্নতি করেছেন, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কিভাবে ধৈর্য ও দৃঢ়তার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দৈনন্দিন সাধারন বিষয়াদী থেকে শুরু করে শত্রুর মোকাবেলার ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (সা.) ধৈর্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এগুলো শেখাতে গিয়ে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, কখন কি করতে হবে?

আজ সর্বপ্রথম আমি যে হাদীস উপস্থাপন করব, সেটি শত্রুর সাথে আচরণ সম্পর্কিত নয় বরং পারিবারিক জীবনে ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে। স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন কিভাবে পার করা প্রয়োজন? এ সম্পর্কে অনেক মহিলাদের

আরো কল্যাণ ও আশীষ লাভের কারন হয়। সে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। তার এ কাজও তার জন্য কল্যাণ ও আশীষ লাভের কারন হয়। কেননা সে ধৈর্য ধারণ করে পূণ্য অর্জন করে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয্ যোহদ, বাবু আল-মুমিনু আমরুহু কুল্লুহু খায়র)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ননা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান ব্যক্তি কোন দুঃখ পেলে বা বিপদে পড়লে, কোন দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও অস্থিরতার শিকার হলে, এমনকি একটি কাঁটা বিধলেও তার কষ্টকে আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) বানিয়ে দেন'। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ)

খোদা তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় লোক সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা সম্বলিত একটি হাদীস রয়েছে, সেটি উপস্থাপন করছি। মুতার্‌রেফ বিন আব্দুল্লাহ বর্ননা করেন, আমার কাছে হযরত আবু যর (রা.) এর একটি বর্ণনা পৌঁছেছে এবং আমি (এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য) তার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখতাম। এরপর তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে বললাম, 'হে আবু যর (রা.)! আপনার একটি বর্ণনা আমার কাছে পৌছেছে। আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখতাম যেন আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি'।

হযরত আবু যর (রা.) বলেন, 'এখন দেখা য়েছে, জিজ্ঞেস কর'। আমি তখন বললাম, 'আমার কাছে পৌছেছে যে আপনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন'। হযরত আবু যর (রা.) বলেন, 'হ্যাঁ আমি আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করার কথা ভাবতেও পারি না'। তিনি একথা তিন বার বলেন। তখন আমি বললাম, 'ঐ তিন ব্যক্তি কারা যাদের আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন'। তখন তিনি বলেন,'ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিদান দেবেন-এ বিশ্বাস নিয়ে মুজাহিদরুপে শত্রুর সাথে লড়াই করতে থাকে এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যায়। তোমরা মহা সম্মানিত ও মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র কিতাবে দেখতে পাও,'আল্লাহ ঐ লোকদের পছন্দ করেন যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে। এবং ঐ ব্যক্তিকে (পছন্দ করেন) যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিলে সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে ও নিজেকে সংযত রাখে। এমনকি সে তার জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাকেই যথেষ্ট মনে করে। আর ঐ ব্যক্তি যে তার জাতির সাথে সফরে থাকে।

এরপর (ক্লন্তির ফলে) তন্দ্রা ও নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে। অথচ সে ব্যক্তি রাতের শেষ অংশে ঘুম থেকে জাগে এবং ওযু করে ও নামাযে দাঁড়িয়ে যায়'। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন'। তিনি বলেন, 'অহংকারী ও দাম্ভীককে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক ও অহংকারীদের ভালবাসেন না'। এবং সেই অকৃতজ্ঞ কৃপন ব্যবসায়ী যে (মিথ্যা) কসম খেয়ে খেয়ে পন্য বিক্রয় করে।' (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনদ আবু হুরায়রা, খন্ড:৭, পৃ:২১৭)

তিন পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ধৈর্যশীলেরও উল্লেখ রয়েছে। ধৈর্যশীলকে আল্লাহ্ তাআলা খুব পছন্দ করেন।

হযরত আলী (রা.) এক স্থানে বলেছেন, 'ঈমানের সাথে ধৈর্য্যের সম্পর্ক শরীরের সাথে মাথার সম্পর্কের ন্যায়। ধৈর্য না থাকলে ঈমানও থাকেনা। (কানযুল উম্মাল, আল-কিতাবুস্ সালেসু ফীল আখলাকে)

দুঃখ-কষ্টের সময় কিরুপ আবেগানুভূতি প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন? কিভাবে দোয়া করা প্রয়োজন? এসব বিষয়ে এক জন বিশ্বাসীর সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.) এসব বিষয় আমাদের শিখিয়েছেন।

এ সম্পর্কে একটি হাদীসে উল্লেখ এসেছে, উম্মে সালামা (রা.) বর্ননা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে বান্দা কোন কষ্ট বা বিপদে পড়লে এ দোয়া করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন আল্লাহুম্মা আজেরনী ফি মুসিবাতী ওয়াখলুফলী খাইরাম্ মিনহা'। অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদে পুরস্কার দাও এবং এরপর আমাকে এর চাইতে উত্তম (অবস্থা) দান কর'। তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন এবং এরপর তাকে এর চাইতে উত্তম অবস্থা দান করবেন। (আল-জামেউ লেশু'বিল ঈমান, বাবুস্ সাবরে ফিল মাসায়েবে, খন্ড:১২, পৃ:১৮২)

এসব বিপদাবলী ও কষ্ট সমূহ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন রয়েছে, তেমনি জামাতী ও জাতীয় জীবনেও রয়েছে। সব ক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন করতে হবে যে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনত থেকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, ধৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থেকে তার কাছে প্রতিদান যাচনা করে যেতে হবে। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমেও সর্বপ্রকার পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য্য ধারণকারীদের সম্পর্কে একথাই বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন উলাইকা আলাইহীম সালাওয়াতুম মির্ রাব্বিহীম ওয়া রাহমা ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন'। (আল-বাকারা:৫৭-৫৮)

অর্থাৎ তাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা ঘাবড়ে যায় না, বরং বলে আমরা তো আল্লাহ্‌র জন্যই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এরাই ঐসব লোক যাদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী ও করুনা বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত।' সুতরাং কুরআন করীমের আদেশও এটাই (যে তোমরা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ কর)।

এখন আমি আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের কিছু ঘটনা পেশ করব যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, তার সান্যিধ্যে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে (সা.) প্রশিক্ষন লাভ করেছেন এবং ধৈর্যের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

হযরত আয়শা (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যখন মুসলমানগণ (মুশরিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ট হয়ে পড়লেন, তখন হযরত আবুবকর (রা.) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌঁছলে ইব্‌ন দাগিনার সাথে তার সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবু বকর, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবু বকর (রা.) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে।

তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্‌ন দাগিনা বলল, হে আবু বকর (রা.) আপনার মত ব্যক্তি (মক্কা থেকে) নিজে নিজেই চলে যাওয়া উচিৎ নয় এবং লোকদের জন্য আপনাকে (মক্কা) থেকে বের করে দেওয়াও শোভনীয় নয়। আপনি মিটে যাওয়া ভাল কাজগুলো করে থাকেন, আত্মীয়তার

আরো কল্যাণ ও আশীষ লাভের কারন হয়। সে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। তার এ কাজও তার জন্য কল্যাণ ও আশীষ লাভের কারন হয়। কেননা সে ধৈর্য ধারণ করে পূণ্য অর্জন করে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয্ যোহদ, বাবু আল-মুমিনু আমরুহু কুল্লুহু খায়র)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ননা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান ব্যক্তি কোন দুঃখ পেলে বা বিপদে পড়লে, কোন দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও অস্থিরতার শিকার হলে, এমনকি একটি কাঁটা বিধলেও তার কষ্টকে আল্লাহ্ তাআলা তার গুনাহের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) বানিয়ে দেন'। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ)

খোদা তাআলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় লোক সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা সম্বলিত একটি হাদীস রয়েছে, সেটি উপস্থাপন করছি। মুতার্‌রেফ বিন আব্দুল্লাহ বর্ননা করেন, আমার কাছে হযরত আবু যর (রা.) এর একটি বর্ণনা পৌঁছেছে এবং আমি (এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য) তার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখতাম। এরপর তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে বললাম, 'হে আবু যর (রা.)! আপনার একটি বর্ণনা আমার কাছে পৌছেছে। আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখতাম যেন আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি'।

হযরত আবু যর (রা.) বলেন, 'এখন দেখা য়েছে, জিজ্ঞেস কর'। আমি তখন বললাম, 'আমার কাছে পৌছেছে যে আপনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন'। হযরত আবু যর (রা.) বলেন, 'হ্যাঁ আমি আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করার কথা ভাবতেও পারি না'। তিনি একথা তিন বার বলেন। তখন আমি বললাম, 'ঐ তিন ব্যক্তি কারা যাদের আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন'। তখন তিনি বলেন,'ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিদান দেবেন-এ বিশ্বাস নিয়ে মুজাহিদরুপে শত্রুর সাথে লড়াই করতে থাকে এবং অবশেষে শহীদ হয়ে যায়। তোমরা মহা সম্মানিত ও মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র কিতাবে দেখতে পাও,'আল্লাহ ঐ লোকদের পছন্দ করেন যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে। এবং ঐ ব্যক্তিকে (পছন্দ করেন) যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিলে সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে ও নিজেকে সংযত রাখে। এমনকি সে তার জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাকেই যথেষ্ট মনে করে। আর ঐ ব্যক্তি যে তার জাতির সাথে সফরে থাকে।

এরপর (ক্লন্তির ফলে) তন্দ্রা ও নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে। অথচ সে ব্যক্তি রাতের শেষ অংশে ঘুম থেকে জাগে এবং ওযু করে ও নামাযে দাঁড়িয়ে যায়'। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা অপছন্দ করেন'। তিনি বলেন, 'অহংকারী ও দাম্ভীককে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিক ও অহংকারীদের ভালবাসেন না'। এবং সেই অকৃতজ্ঞ কৃপন ব্যবসায়ী যে (মিথ্যা) কসম খেয়ে খেয়ে পন্য বিক্রয় করে।' (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনদ আবু হুরায়রা, খন্ড:৭, পৃ:২১৭)

তিন পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ধৈর্যশীলেরও উল্লেখ রয়েছে। ধৈর্যশীলকে আল্লাহ্ তাআলা খুব পছন্দ করেন।

হযরত আলী (রা.) এক স্থানে বলেছেন, 'ঈমানের সাথে ধৈর্য্যের সম্পর্ক শরীরের সাথে মাথার সম্পর্কের ন্যায়। ধৈর্য না থাকলে ঈমানও থাকেনা। (কানযুল উম্মাল, আল-কিতাবুস্ সালেসু ফীল আখলাকে)

দুঃখ-কষ্টের সময় কিরুপ আবেগানুভূতি প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন? কিভাবে দোয়া করা প্রয়োজন? এসব বিষয়ে এক জন বিশ্বাসীর সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.) এসব বিষয় আমাদের শিখিয়েছেন।

এ সম্পর্কে একটি হাদীসে উল্লেখ এসেছে, উম্মে সালামা (রা.) বর্ননা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে বান্দা কোন কষ্ট বা বিপদে পড়লে এ দোয়া করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন আল্লাহুম্মা আজেরনী ফি মুসিবাতী ওয়াখলুফলী খাইরাম্ মিনহা'। অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদে পুরস্কার দাও এবং এরপর আমাকে এর চাইতে উত্তম (অবস্থা) দান কর'। তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন এবং এরপর তাকে এর চাইতে উত্তম অবস্থা দান করবেন। (আল-জামেউ লেশু'বিল ঈমান, বাবুস্ সাবরে ফিল মাসায়েবে, খন্ড:১২, পৃ:১৮২)

এসব বিপদাবলী ও কষ্ট সমূহ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন রয়েছে, তেমনি জামাতী ও জাতীয় জীবনেও রয়েছে। সব ক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন করতে হবে যে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনত থেকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, ধৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থেকে তার কাছে প্রতিদান যাচনা করে যেতে হবে। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমেও সর্বপ্রকার পরীক্ষা ও বিপদে ধৈর্য্য ধারণকারীদের সম্পর্কে একথাই বলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'আল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন উলাইকা আলাইহীম সালাওয়াতুম মির্ রাব্বিহীম ওয়া রাহমা ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন'। (আল-বাকারা:৫৭-৫৮)

অর্থাৎ তাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা ঘাবড়ে যায় না, বরং বলে আমরা তো আল্লাহ্‌র জন্যই এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এরাই ঐসব লোক যাদের উপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী ও করুনা বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত।' সুতরাং কুরআন করীমের আদেশও এটাই (যে তোমরা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ কর)।

এখন আমি আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের কিছু ঘটনা পেশ করব যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, তার সান্যিধ্যে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে (সা.) প্রশিক্ষন লাভ করেছেন এবং ধৈর্যের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

হযরত আয়শা (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যখন মুসলমানগণ (মুশরিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ট হয়ে পড়লেন, তখন হযরত আবুবকর (রা.) হিজরত করে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌঁছলে ইব্‌ন দাগিনার সাথে তার সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবু বকর, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবু বকর (রা.) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে।

তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্‌ন দাগিনা বলল, হে আবু বকর (রা.) আপনার মত ব্যক্তি (মক্কা থেকে) নিজে নিজেই চলে যাওয়া উচিৎ নয় এবং লোকদের জন্য আপনাকে (মক্কা) থেকে বের করে দেওয়াও শোভনীয় নয়। আপনি মিটে যাওয়া ভাল কাজগুলো করে থাকেন, আত্মীয়তার

সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করে থাকেন এবং অভাবীদের দুঃখ মোচন করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগীতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবু বকর (রা.) ফিরে এলেন। তার সঙ্গে ইব্‌ন দাগিনাও এল।

ইব্‌ন দাগিনা রাতে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবু বকরের মত লোক দেশ থেকে নিজে নিজেই বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেয়া যায় না। আপনারা কি তার মত এমন উত্তম ও পূণ্যবান ব্যক্তিকে বের করে দিবেন? ইব্‌ন দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগন মেনে নিল এবং তারা ইব্‌ন দাগিনাকে বলল, তুমি আবু বকরকে বলে দাও, তিনি যেন তার রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন এবং নামায যেন সেখানেই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তেলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমরা আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের ফিতনায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। ইবনে দাগিনা এসব কথা আবু বকর (রা.)-কে বলে দিলেন।

সে মতে কিছুকাল আবু বকর (রা.) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। প্রকাশ্যে নামায আদায় করতেন না এবং ঘরেই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর আবু বকরের মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হল। তাই তিনি তার ঘরের উঠানে একটি মসজিদ নির্মান করে নিলেন। এতে তিনি নামায আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তার কাছে মুশরিক মহিলা ও যুবকগণ ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবু বকর (রা.)-এর একাজে বিস্মিত হত এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তার চোখের অশ্রু শামলিয়ে রাখতে পারতেন না।

এ ব্যাপারটি মুশরিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে এলে তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারনে আমরাও আবু বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এ শর্তে যে, তিনি তার রবের ইবাদত তার ঘরে করবেন। কিন্তু সে শর্ত তিনি লঙ্ঘন করেছেন এবং নিজ ঘরের উঠানে একটি মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে নামায ও তিলাওয়াত আরম্ভ করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও সন্তানরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর সে তোমার অশ্রয়ে থাকতে চায় কি না? তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করাকে খুব অপছন্দ করি, আবার আবু বকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না।

আয়শা (রা.) বলেন, ইবনে দাগিনা এসে আবু বকর (রা.)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে কী শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয় তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমাকে আমার জিম্মাদারী ফেরত দিবেন। আমি একথা আদৌ পছন্দ করিনা যে আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হউক। আবু বকর (রা.) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের উপরই সন্তুষ্ট আছি। (বুখারী, কিতাবু মানাকেবুল আনসার, বাব-হিজরাতুন্নবীয়ে ওয়া আসহাবিহী ইলাল মদীনাতে)

এরপর কুরায়শগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি অনড় শিলাখন্ডের ন্যায় নিজের অবস্থানে অটল থাকেন। বর্ণনায় এসেছে, কাফেরগণ হযরত আবু বকর (রা.) কে খুব মারপিট করে। তার মাথা ও দাড়ী ধরে এমন ভাবে টানা হয় যে তার অধিকাংশ চুল পড়ে যায়। এসব অত্যাচারের পরও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। (আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ১ম খন্ড, বাব-আলইসতেখফাউহু ওয়া আসহাবুহু ফী দারুল আরকাম ইব্‌ন আবি আরকাম, পৃ:৪১)

আমার স্মরন হল, পাকিস্তানেও এ অবস্থাই বিরাজ করছে। তারা বলে, তোমরা নামায পড়তে পারবে না। তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বিভ্রান্ত করবে। তোমরা নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করে লোকদের চোখে ধোকা দেবে। এজন্য এ আইন পাশ হয়েছে। অন্যান্য বিষয়তো রয়েছেই, গতকাল দু-এক স্থান থেকে এ সংবাদ এসেছে, এমনকি সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়েছে, পাকিস্তানে অ-আহমদী মৌলভীরা এ রিপোর্ট পুলিশের কাছে পেশ করেছে যে আহমদীরা কুরবানীর ঈদে কুরবানী করে। এটিতো ইসলামী রীতি-নীতির অন্তর্ভূক্ত। এজন্য তাদেরকে এটি করতে দেয়া যাবেনা। কেননা এতে আমাদের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লাগে। এ সংবাদ এখানেও পৌঁছে গেছে।

আর পুলিশের অবস্থা হল, তারা আহমদীদের ডেকে সতর্ক করেছে যে তোমরা যদি কুরবানী করতে চাও তবে চার দেয়ালের ভেতরে কর, কোন ভাবেই যেন বাইরে প্রকাশ না হয়। কেননা তোমাদের কুরবানী করার অধিকার নেই এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অধিকার তোমাদের নেই। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসব আহমদীরা পূর্ব থেকেই কুরবানী তাদের ঘরেই করতেন এবং নিজেদের আপনজন ছাড়া খুব নিকটের লোকদের কাছেও তাদের কুরবানীর বিষয়টি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু তাদের একটি ফাসাদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা ছিল, তাই তা করার চেষ্টা করেছে। তারা চায় যেন কোন না কোন বাহানা তাদের হাতে আসতে থাকে।

এক বর্ণনায় একজন মহিলার ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার ঈমানোদ্দিপক ঘটনা পাওয়া যায়। হযরত উম্মে শরীক (রা.) ইসলাম গ্রহন করার পর কুরায়শ মহিলাদের গোপনে তবলীগ করতে থাকেন। কুরায়শরা এটি জানতে পেরে তাকে বলে, আমরা তোমাকে আমাদের গোত্রের কাছে নিয়ে যাব। এরপর তারা হযরত উম্মে শরীককে উটের নগ্ন পিঠে চড়ায়। তিনি বলেন, এ অবস্থায় তারা আমাকে তিন দিন পানি পান করতে দেয়নি, খাবারও খেতে দেয়নি। অবস্থা এমন হল যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

এরপর তারা এক স্থানে থামল। তারা নিজেরা ছায়ায় বসল আর তাকে রোদে বেঁধে রাখল। হযরত উম্মে শরীক বলেন, ঐ অবস্থায় আমি একটি পানির পাত্র দেখলা ম। সেখান থেকে আমি অল্প অল্প পানি পান করতাম আর সেটি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। এরপর আবার আমি সেটা আকড়ে ধরে কিছুটা পান করতাম আর সেটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। এভাবে অনেকবার হতে থাকে। অবশেষে আমি পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে যাই।

হযরত উম্মে শরীক অবশিষ্ট পানি তার শরীর ও কাপড়ে ঢেলে দেন। যখন লোকেরা উঠে তার দেহে পানির চিহ্ন দেখতে পেল এবং তাকেও ভাল অবস্থায় দেখতে পেল, তখন তারা বলল, রশি প্রভৃতি খুলে তুই আমাদের পানি পান করেছিস । উত্তরে হযরত উম্মে শরীক বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কক্ষনো এমন করিনি। তখন তিনি তাদেরকে সব ঘটনা খুলে বলেন। তারা সব শুনে বললো, তুই যা বলেছিস তা যদি সত্য হয় তবে তোর

ধর্ম সত্য। এর পর তারা তাদের পানির পাত্রগুলোর কাছে গিয়ে দেখল সেখানে তাদের রেখে যাওয়া সবটুকু পানিই আছে। এ ঘটনায় তারা ইসলাম গ্রহণ করে। (আল-আসাবাতু ফী তামীয়ুস্ সাহাবাহ্, ৮ম খন্ড, কিতাবুন্ নিসা, পৃ:৪১৭-৪১৮)

এটা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। আল্লাহ্ তাআলা দ্রুত ধৈর্যের পুরস্কার দিয়েছেন, অভূতপূর্ব ভাবে তিন দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এবং স্বয়ং ব্যবস্থা করেছেন।

আরেকটি বর্ণনা এসেছে, হযরত আবু ফুকাইয়া যিনি আব্দুদ্ দার গোত্রের দাস ছিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহনের পর তার গোত্রের লোকেরা তাকে কষ্ট দেয়া আরম্ভ করে যেন তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি (রা.) (ইসলাম ত্যাগ করতে) অস্বীকার করতেন। বনু আব্দুদ দারের লোকেরা দুপুরের তীব্র গরমে তার কাপড় খুলে এবং দেহ লোহায় মুড়িয়ে দাড় করিয়ে দিত। এরপর একটি পাথর এনে তার পিঠে রেখে দিত। তিনি এ কষ্টে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ও দৃঢ় সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি। (আল-ইসতিআব, খন্ড-৪ , কিতাবুল কুনি, বাব আলফা 'আবু ফুকাইয়া' পৃ-২৯৩)

হযরত বিলাল (রা.) এর ঘটনা আমরা শুনে থাকি। তিনি উমাইয়া বিন খালফের হাবশী গোলাম ছিলেন। উমাইয়া তাকে দুপুরে তীব্র গরমে বাইরে নিয়ে যেত এবং ভূমিতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর বড় বড় পাথর চাপিয়ে বলত, 'লাত ও উজ্জার ইবাদত কর এবং মুহাম্মদকে অস্বীকার কর, নয়তো এভাবে শাস্তি দিতে দিতে তোমাকে মেরে ফেলব'। বিলাল (রা.) বলতেন, 'আহাদ আহাদ'। অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ্ এক। একদিন হযরত আবু বকর (রা.) তার উপর এ নিষ্ঠুর নির্যাতন দেখে উমাইয়া বিন খালফের নিকট একটি গোলামের বিনিময়ে হযরত বিলাল (রা.)-কে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। (সীরাত ইবনে হিশাম)

হযরত খাব্বাব (রা.) সম্পর্কে একটি বর্ননা পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রা.) এর যুগে হযরত খাব্বাব (রা.) একবার তার দরবারে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাকে ডেকে এনে তার বিশেষ সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, 'আপনি আমার সাথে এ বিশেষ আসনে বসার উপযুক্ত। হযরত বেলাল (রা.) ব্যাতিত আমার সাথে এখানে বসার যোগ্য শুধু আপনিই আছেন'। তখন তিনি বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে বিলাল (রা.)-এর যোগ্য। কিন্তু বিলাল (রা.) কে মুশরিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর মত কেউ ছিল। কিন্তু আমাকে তাদের যুলুম থেকে বাঁচানোর কেউ ছিল না। একদিনের ঘটনা, কাফেররা আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং আগুন জ্বালিয়ে সেখানে আমাকে নিক্ষেপ করে। এরপর তাদের একজন আমার বুকের উপর পা রাখে'। কাপড় উঠিয়ে হযরত ওমর (রা.) কে তিনি তার পিঠ দেখালেন। সেখানে চামড়ার উপর (ত্বক ও চর্বি পোড়ার) দগদগে সাদা দাগ ছিল। (তাবকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃ-৮৮)

হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) কামার ছিলেন। তিনি তলোয়ার বানাতেন। তার মনতুষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কাছে আসতেন। তার মালিক উম্মে আনমার এ বিষয়টি জেনে যায়। সে একটি লোহা গরম করে তার মাথায় রেখে দিত। হযরত খাব্বাব (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে বিষয়টি বলেন । তিনি (সা.) তার জন্য দোয়া করেন-'আল্লাহুম্মানসুর খাব্বাবান' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! খাব্বাবকে সাহায্য কর'। এর ফলে তার মালিক উম্মে আনমার এর মাথা ব্যাথা শুরু হয়। এ কারনে সে কুকুরের ন্যায় চিৎকার করতে থাকে। সেখানকার হাকীম (চিকিৎসক) তার জন্য এ চিকিৎসা দেন, লোহা গরম করে তার মাথায় রাখতে হবে। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, 'এরপর আমি লোহা গরম করে তার মাথায় ছেকা দিতাম'। (উসুদুল গাবা, ১ম খন্ড, খাব্বাব বিন আরত, পৃ-৬৭৫)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন,'আল্লাহ তাআলা এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং ধৈর্য্যের পর বদলা নিয়েছেন'।

হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) ওয়ালীদ বিন মুগীরার আশ্রয়ে সকাল সন্ধ্যা নিরাপদে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবাদের যখন যুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত দেখতে পান, তিনি ভাবলেন, খোদার কসম! নিশ্চয় আমার আত্মার বড় কোন দোষের কারনে এক মুশরিক ব্যক্তির আশ্রয়ে আমাকে সকাল সন্ধ্যা পার করতে হচ্ছে। কেননা আমার সাথী ও ধর্মীয় ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র খাতিরে দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করছে। এটি ভেবে তিনি ওলীদ বিন মুগিরার কাছে গিয়ে বললেন,'হে আবু আব্দুশ্ শামস! তোমার আশ্রয় পূর্ন হয়েছে।

আমি তোমাকে তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিচ্ছি'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,'হে আমার ভাতিজা! কেন? আমার জাতির কেউ কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছে?' তিনি বললেন,'না, বরং আমি আল্লাহর আশ্রয় পছন্দ করি এবং তিনি ব্যাতীত অন্য কারো আশ্রয় পছন্দ করিনা। ওয়ালীদ বলল,'তুমি আমার সাথে মসজিদে (অর্থাৎ কাবায়) চল এবং যেভাবে আমি প্রকাশ্যে ঘোষনা করে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, তেমনি প্রকাশ্যে ঘোষনা করে তুমি আমাকে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দেবে'। হযরত ওসমান বিন মাযউন বলেন, আমরা মসজিদে পৌছার পর ওলীদ বললেন,'এ হচ্ছে ওসমান, সে আমাকে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দেয়ার জন্য এসেছে'। হযরত ওসমান (রা.) বললেন,'সে সত্য বলেছে। আমি তাকে আশ্রয় পূর্নকারী এবং সম্মানযোগ্য পেয়েছি। কিন্তু আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করি না। এজন্য আমি তাকে তার আশ্রয় ফিরিয়ে দিয়েছি'।

এরপর হযরত ওসমান চলে গেলেন। লাবীদ বিন রাবীয়া একটি মজলিশে কুরায়েশের লোকজনদের তার কবিতা শোনাচ্ছিল। হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) ও তাদের সাথে বসে গেলেন। যখন লাবীদ বললেন,'আলা কুল্লু শাইইন মা খালাল্লাহা বাতেলুন' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া বাকী সব মিথ্যা'। এটি শুনে হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) বলে উঠেন,'তুমি সত্য বলেছো'। এরপর লাবীদ বলেন,'ওয়া কুল্লু নাঈমিন লা মাহালাতা যায়েলুন' অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে সব নেয়ামত শেষ হয়ে যাবে'। এটি শুনে হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) বলে উঠেন,'তুমি মিথ্যা বলছো।

জান্নাতের নেয়ামত কখনো শেষ হবে না'। তখন লাবীদ বিন রাবিয়া বললেন,'হে কোরায়শের দল! তোমরা কেউ কখনো আমাকে কষ্ট দিতে না। তোমাদের মধ্যে এ রীতি কবে থেকে চালু হয়েছে'। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল,'এ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা নির্বোধ। সে আমাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে। এজন্য তার কথায় তুমি কিছু মনে করো না'। হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) এর জবাব দিলেন। ক্রমে বিষয়টি অনেক দূর গড়াল। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে তার চোখে তীব্র বেগে ঘুষি মারে, ফলে তার চোখ বেরিয়ে আসে। ওলীদ বিন মুগীরা পাশে বসে এসব দেখছিলেন। তিনি বললেন,'আল্লাহর কসম! হে আমার ভাতিজা, তুমি যদি রক্ষাকারী (আমার) আশ্রয়ে থাকতে তবে তোমার চোখের এ কষ্ট থেকে বেঁচে যেতে'।

হযরত ওসমান বিন মাযউন (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার ভালো চোখটিও এ আচরনই চাচ্ছে যা তার সাথীর সাথে হয়েছে। হে আবু আব্দুশ্ শামস! নিশ্চয় আমি সেই সত্ত্বার আশ্রয়ে আছি যে তোমার চাইতে অধিক সম্মানিত ও শক্তিশালী'। ওলীদ বিন মুগীরা

তাকে বললেন,'হে আমার ভাইয়ের ছেলে! এসো, তুমি চাইলে পুনরায় আমার আশ্রয়ে আসতে পার'। কিন্তু হযরত ওসমান তা অস্বীকার করলেন। (সীরাত ইবনে হিশাম, কিস্‌সাতু উসমান বিন মাযউনিন ফী রাদ্দে জিওয়ারিল ওয়ালীদে, পৃ-২৬৯) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সাহাবাদের প্রেম-ভালবাসা এবং ধৈর্য্যের নতুন দৃষ্টান্ত দিলেন। 'রাজী'-এর ঘটনায় যে সব সাহাবাদের বন্দী করা হয়, তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন দাসেনাও ছিলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তার পিতার পরিবর্তে তাকে হত্যা করার জন্য তাকে ক্রয় করেছিলেন।

হত্যা করার জন্য হযরত যায়েদ কে যখন তানঈমে নিয়ে যাওয়ার পর আবু সুফিয়ান তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'হে যায়দ! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, তুমি কি চাওনা যে এখানে তোমার স্থলে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হয় আর তুমি তোমার ঘরের লোকদের মধ্যে থাক'। হযরত যায়েদ উত্তর দিলেন,'আল্লাহর কসম! আমিতো এটাও পছন্দ করি না যে আমার বদলে এখানে মুহাম্মদ (সা.) এর শরীরে একটি কাঁটা বিধে আর আমি আমার ঘরের লোকদের কাছে বসে থাকি'। আবু সুফিয়ান বলেছেন, 'মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণ মুহাম্মদ (সা.)-কে যেভাবে ভালবাসতেন, অন্য কাউকে কারো প্রতি এত ভালবাসা রাখতে দেখিনি'। (উসুদুল গাবা, খন্ড-২, পৃ-১৪৭)

সে যুগের মায়েরা কিভাবে তাদের সন্তানদের ধৈর্য ও সাহস রাখার তাগিদ করতেন সে বিষয়ে একটি বর্ননা রয়েছে। যেদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রা.)-কে শহীদ করা হয়, সেদিন তিনি তার মায়ের কাছে এসেছিলেন। তার মা তাকে বলেন,'হে আমার পুত্র! নিহত হওয়ার ভয়ে কখনো এমন কোন শর্ত কবুল করো না যাতে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হয়। আল্লাহ্‌র কসম! লাঞ্ছনার সাথে চাবুকের আঘাত সহ্য করার চাইতে সম্মানের সাথে তরবারীর আঘাতে মৃত্যু বরন করা উত্তম'। (উসুদুল গাবা, খন্ড-৩, পৃ-১৩৯)

এ বর্ননায় একজন মায়ের দৃঢ়চিত্ততা এবং ঈমানী আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার সন্তানকে তাগিদ করেছেন, ঈমানে কখনো দুর্বলতা দেখিয়ো না। এটি কুরবানী ও ধৈর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যা আমরা ইসলামের ইতিহাসে নারী-পুরুষ ও যুবক-বৃদ্ধ সবার মাঝে দেখতে পাই। এ দৃষ্টান্ত বর্ননা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, 'আমাদের নবী করীম (সা.) তার যুগে নিজ থেকে প্রথমে কখনো তরবারী উঠান নি। বরং একটি দীর্ঘ যুগ কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন এবং এমন ধৈর্য ধরেছেন যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি তাঁর (সা.) সাহাবাগণও আদেশানুযায়ী 'কষ্ট সহ্য কর, ধৈর্য ধর'- এ উচ্চ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তারা ধৈর্য ও সততা দেখিয়েছেন। পায়ের নীচে পিষ্ট হয়েও তারা হার মানেন নি।

তাদের বাচ্চাদের তাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। তাদেরকে আগুন ও পানির মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা এমন ভাবে মন্দ থেকে আত্মরক্ষা করেন যেন তারা বাঘের বাচ্চা। কেউ কি দেখাতে পারবে প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সব নবীর উম্মতের মধ্যে কোন উম্মত খোদার আদেশ শুনে তাদের (উম্মতে মোহাম্মদীয়ার) ন্যায় আত্মসংবরণ করেছে এবং শত্রুর প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থেকেছে। কে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে, পৃথিবীতে এরুপ অন্য কোন দল আছে যারা বীরত্ব, ঐক্য, পেশী শক্তি, প্রতিরোধের শক্তি এবং প্রচন্ড পৌরুষ থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত তের বছর রক্ত পিপাসু শত্রুদের নিকট অত্যাচারিত ও হতাহত হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছে।

রসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর (সা.) সাহাবাগণ কোন আপারগতার জন্য এ ধৈর্য ধারণ করেননি, বরং এ ধৈর্য ধারণের সময়ও তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদের সেই শক্তি ও বাহু বল ছিল যা জিহাদের আদেশের পর তারা প্রদর্শন করেছেন। এমনও হয়েছে যে এক হাজার যুবক বিপক্ষ শত্রুর এক লাখ সৈন্যকে পরাজিত করেছেন। এমনটি এজন্যই হয়েছে যেন লোকেরা বুঝতে পারে মক্কায় শত্রুরা রক্তপাত করা সত্ত্বেও মুসলমানগন যে ধৈর্য ধরেছিল তা তাদের কাপুরুষতা বা দুর্বলতার জন্য নয়, বরং খোদার আদেশে তারা অস্ত্র ধারণ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তারা ছাগল ভেরার ন্যায় জবাই হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এমন ধৈর্য মানবীয় শক্তির বাইরে। আমরা যদি পৃথিবীর সব নবীদের কাহিনী পাঠ করি, তবুও আমরা কোন উম্মতে, কোন নবীর দলে এ উচ্চাঙ্গীন চরিত্র পাই না। যদিও পূর্ববর্তীদের কারো কারো ধৈর্যের কাহিনী আমরা শুনে থাকি, কিন্তু সাথে সাথে অবস্থাদৃষ্টে এটাই সম্ভব বলে মনে হয় যে কাপুরুষতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি না থাকাতেই তারা ধৈর্য ধরেছিলেন। কিন্তু একটি দল যারা সত্যিকার ভাবে নিজেদের ভেতর সামরিক দক্ষতা রাখে এবং বীরত্ব ও সাহসী হৃদয়ের অধিকারী হয়, তাদের যদি কষ্ট দেয়া হয়, তাদের সন্তানদের হত্যা করা হয় এবং তাদের বর্শা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করা হয়, তবুও তারা শত্রুর প্রতিরোধ করে না। এটা সেই পৌরুষত্বের বৈশিষ্ট্য যা নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগনের (রা.) মধ্যে দীর্ঘ তের বছর পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়। দীর্ঘ তের বছর সর্বদা কঠিন বিপদাবলীর সম্মুখীন হয়ে এরুপ ধৈর্য ধারণ করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একটিও নেই।

কারো যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তবে আমাকে বলুন পূর্ববর্তী পূণ্যবানদের মধ্যে এমন ধৈর্যের দৃষ্টান্ত কোথায় আছে? এখানে এটাও স্বরন রাখতে হবে, সাহাবাদের (রা.) উপর এমন নির্মম অত্যাচার হওয়ার পরও নবী করীম (সা.) নিজ থেকে বাঁচার কোন উপায় তাদের বলেন নি। বরং বার বার বলেছেন, এসব দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধর, কেউ শত্রুর মোকাবেলা করার নিবেদন জানালে তিনি (স.) নিষেধ করেছেন, বলেছেন আমার কাছে ধৈর্য ধরার আদেশ এসেছে।

মোট কথা, প্রতিরোধের ঐশী আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা ধৈর্য ধরার তাগিদ করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এ ধরনের ধৈর্যের দৃষ্টান্ত খুঁজে দেখ। সম্ভব হলে হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের মধ্যে এমন ধৈর্যের উপমা আমাদের দেখিয়ে দাও।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সর্বদা ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শনের সৌভাগ্য দান করুন। বিশেষ ভাবে ঐ সব দেশে, পাকিস্তানে ও অন্যান্য স্থানে যেখানে আহমদীদের উপর যুলুম-নির্যাতন হচ্ছে, যাদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ধৈর্য্য ও অবিচলতা দান করুন এবং তার বিশেষ ক্ষমতাবলে তাদের শত্রুদের পর্যুদস্ত করার উপকরন সৃষ্টি করুন। আমাদের সব কাজ যেন খোদা তাআলার সন্তুষ্টি আকর্ষনকারী হয় এবং আমরা যেন তার কৃপা লাভ করতে পারি। আমীন।

অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
সহযোগীতায় ঃ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

মূলঃ আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে
ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

(২য় কিস্তি)

চরিত্র

ভিক্ষা দেওয়া এবং গরিব ও অভাবীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে উসমানের (রা.) উদারতা ও পরার্থসম্মত প্রকৃতি সবার জন্য অনুসরণযোগ্য এবং উদাহরণস্বরূপ। মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি উদার ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। একবার মদীনায় যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, উসমান (রা.) তখন সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হলেন এবং অভাবীদের খাবার প্রদান করলেন। আরেকটি ঘটনায় দেখা যায়, মদীনার লোকজন পানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এক ইহুদির হাতে একটি কুয়ার মালিকানা ছিল, আর বিক্রির ক্ষেত্রে কুয়াটির জন্য সে অত্যন্ত চড়া দাম হাঁকছিল। হযরত উসমান (রা.) পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে সেই কুয়াটি কিনে নেন এবং সেটি মদীনার মুসলমানদেরকে ব্যবহার করার জন্য প্রদান করেন। (History of Islam, p. 380)

হযরত আবু বকরের (রা.) খিলাফত কালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খাদ্যাভাবে মানুষ খুবই কষ্ট করছিল। লোকজনের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত উসমান (রা.) অনেক শস্য নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করেছেন। শহরের ক্ষুধার্ত লোকেরা তার কাছে ছুটে গিয়ে অনুরোধ করলো, তিনি যেন লোকজনের সামর্থ্যের দিকে খেয়াল রেখে শস্যের মূল্য নির্ধারণ করেন এবং বিক্রি করেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪২৪)। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বলেন,

"তোমরা সাক্ষী, আল-মদিনার গরিব ও অভাবীদেরকে আমি সমস্ত শস্যদানা বিনামূল্যে প্রদান করলাম। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৪২৪)।

যখনই মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দান করতে বলতেন, হযরত উসমান (রা.) সর্বদাই অকৃপণ হস্তে দান করতেন। এই অসাধারণ উদারতার কারণে মহানবী (সা.) প্রায়ই হযরত উসমানের (রা.) উচ্চ প্রশংসা করতেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে খাব্বাব বর্ণনা করেনঃ

"আমি সাক্ষী যে, প্রয়োজনের সময়ে গঠিত সেনাদলকে সহযোগিতা করার জন্য মহানবী (সা.) সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে একশত উট ও সেগুলোর জিন ও স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটের দায়িত্ব নিলাম।' এ কথা শুনার পরও মহানবী (সা.) অন্যান্য মানুষের কাছে সহযোগিতার আবেদন রাখতে থাকেন। তখন হযরত উসমান (রা.) আবার বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে দুইশত উট ও সেগুলোর জিন ও স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটের দায়িত্ব নিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন এরপরও মানুষের কাছে আবেদন রাখতে থাকেন, তখন উসমান (রা.) আবারও বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র খাতিরে তিনশত উট ও সেগুলোর জিন ও স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটের দায়িত্ব নিলাম।' এরপর মহানবী (সা.) (মিম্বর থেকে) নামতে নামতে বলেন, "উসমান আজ যা করলো, তারপর তার বিরুদ্ধে আর কিছুই থাকবে না।" (Suyuti p. 162)

গরিবদের প্রতি তার উদারতা এরকম পর্যায়েরই ছিল যে, তাকে গনি (অর্থাৎ ধনী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। মানুষ তার নামের সঙ্গে এই উপাধিটি যুক্ত করে তাকে ডাকতো।

হযরত উসমানের (রা.) অন্যতম উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এটি যে, তিনি খুবই বিনয়ী ছিলেন। তার যে সামাজিক এবং পারিবারিক পটভূমি ছিল, সে-বিচারে এরকম বিনয়ী হওয়াটা খুবই ব্যতিক্রমী বিষয় ছিল। মক্কার ক্ষমতাশালী পরিবারগুলোর একটির সদস্য ছিলেন তিনি। অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকেরা তার আত্মীয় ছিল। তার উপর তিনি ছিলেন অঢেল সম্পদের অধিকারী। এসব কিছু মিলেই তার যে বিশেষ ধরনের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তার অবস্থানে যদি অন্য কোন সাধারণ ব্যক্তি থাকতো, যদি কোন দুর্বল ঈমানের ব্যক্তি থাকতো, তাহলে সে হয়তো বিভিন্ন ছুতায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো। কিন্তু, এর বিপরীতে, হযরত উসমান (রা.) সর্বদাই অতুলনীয় বিনয় প্রদর্শন করেছেন। উসমানের (রা.) বিনয় বিষয়ক একটি মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন আল-হামান। তিনি বলেন,

"আমরা যদি ঘরের মধ্যখানে থাকতাম আর দরোজা যদি বন্ধ থাকতো, তখন তিনি গায়ে পানি ঢালার জন্য পোশাক ছাড়তেন। আর, শালীনতাবোধের কারণে তিনি তার মেরুদণ্ড সোজা করতেন না।"
(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১৬৪)।

যে-সব লোকেরা খুব সুন্দর ও সুশ্রী হয়, তারা সাধারণত তাদের রূপ-সৌন্দর্যের জন্য গর্ব প্রদর্শন করে থাকে। একইভাবে, যারা অগাধ

ধন-সম্পদের মালিক হয় এবং যাদের বিশেষ ধরনের পদমর্যাদা থাকে তারা সাধারণত অন্যান্যদের উপর এসবের দাপট দেখিয়ে থাকে। আর এই দাপট ও প্রাধান্য ফুটে উঠে তাদের চলা-ফেরায়, কথোপকথনে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে। হযরত উসমান (রা.) সম্ভবত মক্কার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এছাড়া, গোটা আরবের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ ছিলেন এবং মক্কার অন্যতম ক্ষমতাশালী ও দুর্ধর্ষ পরিবারগুলোর একটির অর্থাৎ উমাইয়া পরিবারের সদস্য ছিলেন। এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পরও তিনি শুধু বিনয়ীই ছিলেন না, বরং তার চরিত্রে এরকম শিষ্ঠতা দেখা যেত যার তুলনা মেলা ভার। তার অতুলনীয় বিনয় ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি তার দৃঢ় ঈমানেরই ফল এবং তার নেতা ও প্রভূ মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ভালবাসার ফল। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তার পোশাক ঠিকঠাক করেছিলেন যখন হযরত উসমান ঘরে প্রবেশ করছিলেন। আর, মহানবী (সা.) একথাও বলেছিলেন,

"আমি কি সেই ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করবো না, যার সামনে ফেরেশ্‌তারাও লজ্জাবোধ করে?"
(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬২)

আরেকটি হাদীসে দেখা যায়, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন,

"ফেরেশ্‌তারা উসমানের সামনে লজ্জাবোধ করে যেভাবে তারা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের সামনে লজ্জাবোধ করে।" (Suyuti p. 164)

মহানবীর (সা.) অধীনে উসমানের (রা.) ভূমিকা

হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানের অধিকারীও ছিলেন এবং অনেক জ্ঞান রাখতেন। তিনি হাফেজ-এ-কুরআন ছিলেন এবং এক হাজার ছেচল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে হাতিব বলেন:

"হাদীস বর্ণনা করতে ভয় পায় এরকম ব্যক্তি ছাড়া, রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আমি উসমান ছাড়া আর কাউকে দেখি না, যে-কিনা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর মাত্রায় পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন এবং খুবই মনোরমভাবে দিয়েছেন।" (Suyuti p. 164)

হজ্জের সময় করণীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বেশি জ্ঞান রাখতেন। এক্ষেত্রে তার পরে হযরত উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। মহানবী (সা.) যে-সব সাহাবীকে তাদের জীবদ্দশাতেই বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, সেই দশ জন সাহাবীর (রা.) মধ্যে হযরত উসমানও (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জাত-আর-রিকা এবং গাতফান-এ সেনা অভিযানের সময়ে মহানবী (সা.) মদিনায় তার ডেপুটি ইনচার্জ হিসেবে হযরত উসমানকে (রা.) নিয়োগ করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, বদরের যুদ্ধের সময়কালে হযরত উসমানের প্রথম স্ত্রী রুকাইয়াহ (রা.) অসুস্থ্য হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তিনি (রা.) অসুস্থ্য স্ত্রীর সেবা করার জন্য পেছনে [মদিনায়] থেকে যান। এভাবে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান নি। যাহোক, মহানবী (সা.) হযরত উসমানকে (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই গণ্য করেছেন এবং তাকে যুদ্ধলব্ধ মাল-সামানের অংশ প্রদান করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, "বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে

উসমানের নামও অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।"
(History of Islam p. 380)

হুদায়বিয়ার সন্ধি

৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পনের শ' সাহাবী নিয়ে মহানবী (সা.) মদিনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা দেন। তিনি (সা.) উমরা হজ্জ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পান। মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর থেকে মুসলমানরা মক্কায় ফিরে যেতে পারে নি। মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন হযরত উসমান (রা.)।

সাহাবীদের (রা.) নিয়ে মহানবী (সা.) মক্কায় গেলেন এবং হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। মক্কাবাসীর অনুমতি ছাড়া তিনি (সা.) কাবা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে এবং তওয়াফ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি (সা.) মক্কাবাসীর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন। মক্কার বিভিন্ন নেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আলোচনা করার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে লাগলো। তবে তারা কেউই মহানবী (সা.)-কে কাবা তওয়াফ করতে দিতে সম্মত হলো না এবং ফিরে গেল।

(Life of Mohammad p. 109)

মহানবী (সা.) মনে করলেন মুসলমানদের মধ্য থেকে বিচক্ষণ কাউকে মক্কার কুরাইশদের কাছে পাঠানো উচিৎ হবে, যে-কিনা তাদের কাছে মুসলমানদের বক্তব্য ভালভাবে তুলে ধরতে পারবে। প্রথমে খুজার খারাশ বিন উমাইয়াহকে পাঠানো হলো। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাকে আক্রমণ করা হলো এবং মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হলো। অতঃপর, মক্কার নেতৃবৃন্দ ও গোত্রগুলোর উপর প্রভাব আছে এমন কোনো ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন মহানবী (সা.)। প্রথমে হযরত উমর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করা হলো। কিন্তু, উমর (রা.) এই কারণে রাজি হলেন না যে, কুরাইশরা তার প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তার নিরাপত্তা বিধান করার মতো কোনো প্রভাবশালী আত্মীয়ও নেই। (Zafrullah Khan; Chapter 12)। অবশেষে মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে উসমানকে (রা.) পাঠাবেন। কারণ, সে মক্কার প্রভাবশালী পরিবারগুলোর একটির সন্তান।

উসমান (রা.) এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে লিখিত একটি বিবৃতিও দেওয়া হলো। কুরায়শ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে লিখিত এই বিবৃতিটিতে বলা হলো এই সফরের উদ্দেশ্য হলো উমরা করা। আর উমরা ও কুরবানি সম্পন্ন হওয়ার পর মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে বলেও উল্লেখ করা হলো। মহানবী (সা.) উসমানকে আরো নির্দেশ দিলেন মক্কার গরিব মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদেরকে পুনর্নিশ্চয়তা দিতে যে, যদি তারা তাদের ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখে, আল্লাহ তাহলে তাদের জন্য পথ খুলে দিবেন। (প্রাগুক্ত, অধ্যায়-১২)

মক্কায় উসমানের (রা.) অনেক প্রভাবশালী আত্মীয় ছিল। তিনি যখন মক্কার শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তারা তার সঙ্গে দেখা করতে এলো এবং তাকে ঘিরে দাঁড়ালো ও তার নিরাপত্তা বিধান করলো। যখন তিনি আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তিনি তখন বললেন:

"আমরা পবিত্র গৃহ পরিদর্শন করতে এসেছি, পবিত্র গৃহের সম্মান করতে এসেছি এবং সেখানে ঈবাদত করতে এসেছি। আমরা আমাদের সঙ্গে কুরবানির পশু নিয়ে এসেছি এবং এগুলো জবাই করার পর আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করবো।" (প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ১২)

(চলবে)

Press Desk

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

LONDON, 7 July 2011

PRESS RELEASE

PRINCE EDWARD VISITS AHMADIYYA MOSQUE IN SOUTHFIELDS

The Earl of Wessex greeted by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, world Head of Ahmadiyya Muslim Jamaat

HRH, the Earl of Wessex, Prince Edward today paid a visit to the Fazl Mosque in South West London. The Fazl Mosque, commonly known as the 'London Mosque' is owned by the Ahmadiyya Muslim Jamaat and is London's oldest mosque.

Prince Edward arrived at 11.20am and was greeted by a delegation of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, led by its Khalifa, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, who is the worldwide spiritual leader of the community.

The Earl of Wessex was attending in his capacity as a Patron of 'The London Gardens Society' and thus took the opportunity to inspect the
which has won numerous awards over the past few years. The Earl was also able to view a small exhibition about the history of the mosque.

The Earl was accompanied throughout the visit by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, who himself has a keen interest and expertise in horticulture. The Earl also viewed the actual mosque and was keen to learn of its history.

He was also able to view a private garden within the complex where he was pleased to see a large cherry tree cultivated under the supervision of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad over the past few years. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad also informed the Earl about how the Ahmadiyya Khilafat has been based in the UK since 1984 due to the persecution faced by the Jamaat in Pakistan.

At the conclusion the President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat UK, Rafiq Hayat, invited the Earl of Wessex to visit the Jamaat's Baitul Futuh mosque in Morden at a later date.

A number of other local dignitaries also attended including the Mayor of Wandsworth, Councillor Jane Cooper.

Registered Address: 22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

প্রিন্স এডওয়ার্ড কর্তৃক লন্ডনের প্রাচীনতম মসজিদ পরিদর্শন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) মসজিদ প্রঙ্গনে প্রিন্স এডওয়ার্ডকে স্বাগত জানান।

বৃটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড সম্প্রতি সাউথফিল্ড এ অবস্থিত লন্ডনের প্রাচীনতম মসজিদ 'মসজিদ ফজল' পরিদর্শন করেন। লন্ডন মসজিদ নামে পরিচিত মসজিদটি ১৯২৪ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্ল অফ ওয়েসেক্স এডওয়ার্ড লন্ডন মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌঁছলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) তাঁকে স্বাগত জানান।

"লন্ডন গার্ডেন সোসাইটির" পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রিন্স এডওয়ার্ড মসজিদ প্রঙ্গনের বাগান পরিদর্শন করেন যা বিগত কয়েক বছর যাবত লন্ডনের অন্যতম উৎকৃষ্ট বাগান হিসেবে বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করে আসছে।

প্রিন্স মসজিদ প্রাঙ্গনের ফুলের বাগান ও তৎসংলগ্ন চেরী বাগানও পরিদর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রিন্স এডওয়ার্ড মসজিদের ইতিহাস এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন এবং এবিষয়ে আরো জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রিন্স এডওয়ার্ডকে ইসলামী বিভিন্ন বই-পুস্তক উপহার দিচ্ছেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা তাঁকে জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই পুস্তক উপহার দেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক হায়াত প্রিন্স এডওয়ার্ডকে মর্ডেনে অবস্থিত জামা'ত কর্তৃক নির্মিত পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ 'বাইতুল ফুতুহ' পরিদর্শনেরও আমন্ত্রণ জানান।

এ সময় অন্যান্যদের মাঝে প্রিন্সের সাথে ওয়ান্ডসওয়ার্থের মেয়র ও কাউন্সিলর জেন কুপারও এতে উপস্থিত ছিলেন।

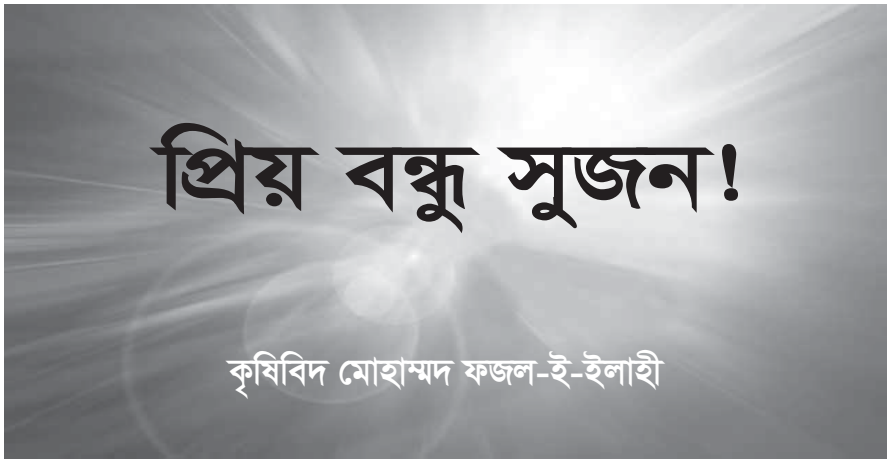

প্রিয় বন্ধু সুজন!

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

["বন্ধু সুজন" মূলত: আমার অতীত জীবনের সহকর্মী ও সহপাঠীবৃন্দ। আমার জীবন চলার পথে আমি যাদেরকে যেখানে পেয়েছি এবং যাদের সাথে আমার ধর্ম বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদেরকেই আমি আমার আজকের লেখায় 'সুজন বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছি। নন-আহমদী সব পাঠকই আমার সুজন বন্ধু]

'হে বন্ধু সুজন!

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি ভালই আছেন। আপনাকে লেখা মনে হয় এটাই আমার শেষ চিঠি। আমরা উভয়ে নিম্ন বিদ্যালয় হতে শুরু করে মহা ও বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি কর্মক্ষেত্রেও অনেকবার অনেক স্থানে একসাথে অবস্থান করেছি। অধুনা অবসরে যাওয়ার সুবাদে আমরা দূরান্তে পৃথক অবস্থান করছি। হয়তবা হঠাৎ একদিন সবার অলক্ষ্যে আরো দূরে অজানা অনন্ত জীবনে চলে যাব। সুতরাং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আপনার সাথে আমার নিবিড় সাক্ষাতে কথা বলার আর কোন সুযোগ হচ্ছে না। জীবন সায়াহ্নে এসে আপনার কাছে দেয়া শেষ পত্রে শেষ কথা বলছি। মূলত: তা পূর্বের কথারই চর্বিতচর্বন।

আপনি তো জানেন যে, আমি আহমদীয়া জামা'তের একজন সদস্য। আমার ধর্ম বিশ্বাস ও আমার জামা'তের পরিচয় এবং এর ঐশী কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়ে বিগত দিনে আপনার সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। তর্ক-বিতর্ক ও বাক দ্বন্দ্ব হয়েছে। বিভিন্ন আলাপচারিতায় এ বিষয়ে আপনি আমাকে অনেকবার অনেক ভাবে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমি তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে আমার অকাট্য যুক্তিকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন। আবার কখনো বা পরাজয়ের ভয়ে আমাকে উত্তপ্ত বাক্যে কটাক্ষ করেছেন, রাগে ক্ষোভে তিরস্কার করেছেন। পুনশ্চ এই শেষ পত্রে শেষ বারের মত সেই একই কথা আবার আপনাকে বলতে চাই।

বিষয়টাকে কিন্তু হালকা করে দেখলে চলবে না। মোটেই তা হালকা করে দেখা বা ভাবার বিষয় নয়। এর সাথে জীবনের সফলতা বা বিফলতার বিষয় জড়িত। কারণ যামানার প্রতিনিধি খোদার পক্ষের দাবীকারক আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা (আমি যে জামা'তের অনুসারী) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মান্য করার ব্যাপারে তিনি কিন্তু খুব হালকা কথা বলেননি।

তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং প্রচন্ড আক্রমণ সমূহের দ্বারা তিনি তাঁর সত্যতাকে প্রকাশ করবেন।' হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে" (মুসনাদ)। খোদা প্রদত্ত মহা পবিত্র প্রতিনিধিদ্বয়ের উক্ত উক্তি দু'টি মোটেই হালকা করে বিবেচনা করার বিষয় নয়। কেননা একে অমান্য করার পিছনে রয়েছে কঠিন সতর্কবাণী, ইহকাল ও পরকাল সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

আমি প্রায়শ: লক্ষ্য করছি যে, ধর্ম জগতের কোন শুভ বার্তা বা মানবাত্মার কল্যাণার্থে নবী-রাসূল আগমনের শুভ সংবাদ শ্রবণে আপনি মোটেই তেমন উল্লাসিত হননা বা নির্মল চেতনায় চিন্তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যতটা কিনা আপনি পার্থিব সফলতার ব্যাপারে ভাবেন। অথচ আপনার দায়িত্বাবলীর মধ্যে এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। পার্থিব ব্যুৎপত্তি লাভ, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, মানে ও সম্মানে কুলীন আর সম্পদ সম্ভারে তুলনাহীন হওয়ার ব্যাপারে আপনার মেধা ও সাধনা বিনিয়োগে যেভাবে আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবেন, আত্মাকে খোরাক দান ও তার উন্নয়নকল্পে আপনি মোটেই তেমনটি ভাবেন না। অর্থাৎ এ বিষয়ে আপনার ভাববার ক্ষেত্রটি একেবারে শুষ্ক মরুতুল্য। এক্ষেত্রে খোদা তাআলা বলেছেন, **"ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন"** অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন আমার ইবাদত করে" (৮১ : ৫৭)। অথচ আল্লাহ্‌র স্মরণে ইবদাত করা ও সেই ইবাদতে সফলতা লাভের পথ উদ্ঘাটনের ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্টা একেবারেই শূন্য।

আপনার সম্পর্কে আমার অনুরূপ মন্তব্য প্রদান এ কারণেই যে, আমি যতবারই আপনার সামনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন এবং তাঁকে গ্রহণ করার গুরুত্বের কথা বলেছি, আপনি ততবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। কখনো অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সচকিত সজাগ হয়ে আমাকে গভীরভাবে জানতে চাননি। আপনার অভিজ্ঞান খাঁটিয়ে আমাকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি। আমি বারংবার জোর তাগিদে সেই বাল্য বয়স থেকেই যখন আমরা দুয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে একান্ত সহপাঠি হিসেবে ছিলাম, তখন হতেই আমি ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের সময় ও লক্ষণগুলি আপনাকে বলে আসছিলাম।

যেমন: "তখন ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়া যাইবে, জাহেলিয়াত প্রসার লাভ করিবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হইবে, পুরুষের সংখ্যা কম হইবে এবং স্ত্রী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, পুণ্য কাজ কমিয়া যাইবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরিয়া যাইবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি ফাসাদ বৃদ্ধি পাইবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হইবে, ভূমিকম্প বেশী হইবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মানুষ গৌরব অনুভব করিবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন ইহবে, দলের সর্দার দুর্নীতিপরায়ণ হইবে, কবরের লাশগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হইবে, উটনী বেকার হইবে ইহাতে চড়িয়া মানুষ সুদূরে যাতায়াত করিবে না। জাতির নীচ লোক তাহাদের নেতা হইবে," (বুখারী, মুসলিম)।

একই সাথে একথাও বলেছিলাম যে, তাদের মসজিদগুলি চাকচিক্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমন্ডিত হবে কিন্তু সেখানে প্রকৃত হেদায়াত থাকবে না। আর মসীহ্ (আ.)-এর দাবীর সত্যতার

সপক্ষে পৃথিবী সৃষ্টি অবধি যে ধরনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়নি এমন বিরল ঘটনার চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংগঠিত হবে। অর্থাৎ একই রমযান মাসের চন্দ্র গ্রহণের প্রথম তারিখের রাতে চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ হবে চন্দ্র মাসের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখের মধ্যম রাতে অর্থাৎ ২৮ তারিখের রাতে, (দারকুৎনী)। বিজ্ঞানের চিন্তায় সম্পূর্ণ অসম্ভব এ গ্রহণ কেবল মাত্র ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবেই হবে।

উল্লেখ্য যে, এই ব্যতিক্রমধর্মী চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ১৮৯৪ সালে পৃথিবীর পূর্ব এবং ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে একই রমযান মাসে সংগঠিত হয়ে গিয়েছেও বটে। অথচ আপনি সেই তখন থেকেই বলে আসছেন, "পৃথিবীতে এখনো অনুরূপ আলামত চিহ্ন পূর্ণভাবে দেখা যায় নি। তবে পরিবেশ বলছে তা শুরু হতে যাচ্ছে। অচিরেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন যুগ শুরু হবে। মৌলবী মৌলানাগণই আমাদেরকে এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়ে সজাগ সচেতন করবেন।" পক্ষান্তরে কিতাব "ফতুহাতে মক্কিয়া" পৃ: ৩৭৩ এ বর্ণিত রয়েছে, "যখন ইমাম মাহ্‌দী (আ.) জাহির হবেন তখন তাদের মৌলবী মৌলানাগণই তাঁর প্রধান শত্রু ও অন্তরায় হয়ে তাঁর বিরোধিতা করবে।"

হে বন্ধু সুজন? বক্তব্য এত স্পষ্ট হওয়া সত্বেও আপনি কিভাবে আপনার আত্মার মুক্তির জিম্মাধারী সেই দুর্জন মৌলবীগণের দায়িত্বে অর্পন করেই আপনি নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে অচেতন ঘুমাচ্ছেন? অথচ খোদা বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। ....." (৩১ : ৩৪)। এ কারণে বলতে হয়, নিশ্চয় আপনি আপনার আত্মার যত্নের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন।

খোদা তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের সূরা মায়েদার ১১৭-১১৮ নং আয়াতে হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর স্পষ্ট সংবাদ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) ও মেরাজের রাতে হযরত ঈসা (আ.)-কে অন্য সব মৃত নবীগণের সাথে দ্বিতীয় আকাশে অবস্থান করতে দেখেছেন। অথচ আপনার বিশ্বাস নির্ভর মৌলানারা এর বিপরীত কথা বলছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা এখনও চৌঠাকাশে সশরীরে জীবিত আছেন। পূর্ববত চেহারা, স্বাস্থ্য অবয়ব ও বয়স নিয়ে পুনরায় ২ হাজার বছর পর মরধরায় আগমন করত: শ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ উম্মতকে কুরআনের শিক্ষার আঁচে সংশোধন করে জান্নাতবাসী করবেন। অপরদিকে তাঁর স্ব উম্মত খ্রিষ্টানজাতি পথভ্রষ্ট ও কোপগ্রস্থ হয়েই রইল। পবিত্র কুরআন কখনও এমন উদ্ভট বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বলে না, কুরআন মানুষকে কখনও এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার কথা স্বীকার করার শিক্ষা দেয় না। প্রকারান্তরে তারা আপনাকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করছে। কুরআনের সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শিক্ষাকে বিকৃত করছে।

কুরআনকে অন্যান্য ধর্ম মতাদর্শের কাছে পরাজিত করছে, (সুবহান আল্লাহ্) এ কথাগুলিকে আমি অনেকভাবে অনেক করে আপনাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শতবারই ব্যর্থ হয়েছি। আপনার ভ্রান্ত অবস্থান থেকে আপনাকে মোটেই নড়াতে পারিনি। আপনার সাথে আমার পরিচয়ের ৫০ বছর পর পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়ার প্রক্কালেও আপনি সেই একই সিদ্ধান্ত ও একই যুক্তিতে অনড় দাঁড়িয়ে আছেন, যা খোদার সিদ্ধান্তের বিপরীত।

আপনার সুদীর্ঘ জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, বিচার বিশ্লেষণশক্তি, আপনার আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে মোটেই আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। আপনার উদ্দেশ্যে লেখা আমার শেষ পত্রে আবারও উদাত্ত আহ্বান যে, আমার কথাগুলিকে আপনার দরাজদিলে বিবেচনা করুন। সম্প্রতি বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন। আপনি ভেবে বলুন, আত্মার সাথে নিভৃতে ভাবুন এবং বলুন মানুষের স্বভাব চরিত্রের অধ:পতন হয়েছে কিনা? ধর্মীয় বিশ্বাস আচারানুষ্ঠান ও নৈতিক চরিত্রের অধ:পতন হয়েছে কিনা? মুসলমান কিংবা মুসলিম দেশই বলুন আর অন্যসব ধর্মানুসারী দেশের কথাই বলুন, সেখানে নির্মল নৈতিকতা বা তাক্‌ওয়া পরায়ণতার লেসমাত্র গন্ধ আছে কি? এর কোনটার উত্তরই হ্যাঁ হবার নয়।

যদি তা-ই হয়, তবে মানব চরিত্রের এহেন জঘন্যতম পরিণতির পরিস্থিতিতে এর এসলাহ কল্পে ইলাহী জগতের কোন প্রতিনিধি আগমনের প্রয়োজন নাই কি? আঁ-হযরত (সা.)-এর দেয় ভবিষ্যদ্বাণী মতে যুগ সংস্কারকের আসার দরকার নাই কি? আপনার সদ্ভাবনার জগতে ইহাই আমার শেষ প্রশ্ন।

বর্তমান যুগে হরেক রকম ঐশী আযাব ও এর দ্বারা সাধিত ধ্বংস যজ্ঞের কথা নিশ্চয় আপনারা সৎ বিবেক স্বীকার করবে। প্রলয় সাদৃশ্য এ দুর্যোগ দুর্ঘটনা ঘটার কারণও আপনাকে বিবেচনা করা দরকার। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, ".....ওয়ামা কুন্না মুয়াজ্জিবিনা হাত্তা নাব আসা রাসূলা অর্থাৎ এবং আমরা কখনো কোন জাতিকে আযাবে নিপতিত করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা (তাদের মাঝে) আমার রাসূল পাঠাই" (১৭ : ১৬)।

যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যাঁকে আমরা আহমদীগণ সত্য দাবীকারক বলে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং প্রয়াশ:ই আপনাকে যাঁর দাওয়াত দিয়ে আসছি, তিনি বলেছেন, "হে এশিয়া! তুমিও নিরপদ নহ, হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ, হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না, আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলি মানবশূন্য পাচ্ছি। দীর্ঘকাল থেকে খোদা নীরব ছিলেন, তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন।"

এখানে নির্দ্বিধায় এই সত্য স্বীকার করতে হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক পরিবেশে, দেশে ও আন্ত:দেশে, জলে ও স্থলে, সর্বত্রই খোদার এই কঠিন কঠুর রূপের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, কলে ও কৌশলে উন্নতির শীর্ষে পৌছেছি বটে কিন্তু খোদার স্নেহশীষ লাভের ক্ষেত্রে আমরা অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারিনি। সেখানে আমাদের বুদ্ধি ও আকল বিকল হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের কোন সফলতা নেই, কেননা আমাদের আকলের সাথে দয়াময় খোদার অনুকম্পার সংমিশ্রণ নেই। অতএব আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যতই চেচামেচি করছি না কেন এর পরিণাম পরিণতি কেবলই শঙ্কা সংকুল হচ্ছে।

হে বন্ধু সুজন! আমরা যদি এই মর্মন্তুদ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই, সত্য সত্যই আমাদের আত্মাকে স্বর্গীয় খাদ্য খাইয়ে পরিতৃপ্ত করতে চাই এবং অত:পর শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা বলে স্বীকৃতি পেতে চাই তাহলে আমাদের উচিত হবে দাবীকৃত যুগ মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পথ ও মতের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা। তাঁর দলে শামিল হয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করা। এতদ্ব্যতীত আমাদের জন্য বিকল্প আর কোন পথ খোলা নেই।

আমরা আহমদীগণ সেই কাজটি করেছি। সাথে আপনাকেও আহ্বান জানাচ্ছি সেই কল্যাণমন্ডিত পথের পথিক হয়ে পথ চলার জন্য। যুগের এই প্রতিনিধি যাঁর পক্ষে খাকসার আপনাকে এতক্ষণ এতসব কথা বললাম, তিনি আপনাকে আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুসৃত ভ্রান্ত ও অপবিত্রতার কালো অন্ধকার পথ হতে কুড়িয়ে নিয়ে পবিত্রতার আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরিয়ে আনতে চান। আর তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাজের সাফল্যের জন্য আপনার সাহায্য পেতে খোদা সকাশে অহর্নিশি আহাজারি করছেন। যদি আপনি আপনার নির-অহংকার চিত্তদিলে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য ও লেখার পরতে পরতে, কাব্য কবিতার ছন্দে-চ্ছত্রে বিচরণ করেন তবে তথায় অবশ্যই আপনি স্বর্গীয় সুন্দর সত্যের সন্ধান পাবেন।

আপনাদের সৌজন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আহ্বান শুনুন। তিনি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "হে বন্ধুগণ! অধর্মের বন্যাস্রোত শত লক্ষ মানবাত্মা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আফসোস ও দুঃখ তাদের জন্য যারা তাদের চোখ মেলে তা তাকিয়ে দেখে না। তোমার নিকট নিবেদন যে, তুমি তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তোমার সাচ্চা ঈমানের পরিচয় দাও এবং আল্লাহ্‌র মন্ডলীতে যোগদান কর।" (পুস্তক বারাকাতুদ দোয়া পৃঃ ৪৬)। তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমরা এরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যেন আকাশ হতে ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দর্শনে বিস্মিত হয়ে তোমাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন" (পুস্তক আমাদের শিক্ষা পৃঃ ৪০)।

সুতরাং হে বন্ধু! আসুন, আমরা সবাই এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে স্বর্গ কর্তৃক মনোনীত একই নেতার নেতৃত্বে দুহাত তোলে মুনাজাত করি, "হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যেসবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তুমি আমাদেরকে তার সবটুকু দান কর এবং কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না, নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না" (৩ : ১৯৫)।

খোদা কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তিনি তাঁর প্রেম প্রার্থী বান্দার প্রতি ততটাই মমতাময় ও দয়ার্দ্র যতটা কিনা একজন মা তার সন্তানের প্রতি দয়ার্দ্র। খোদা তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলেন, "এবং তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগানসমূহ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নহর সমূহ......."(২ : ২৬)

সবশেষে কথা হলো, হে সুধী সুজন বন্ধু! আমি খুব সংক্ষেপে জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত লেখার কোন অবকাশ নেই। অন্যথায় সম্পাদক সাহেব হয়তবা তা তার পত্রিকায় ছাপিয়ে আপনার নজরে আনার চেষ্টা করবেন না। মহা সড়কে বাসের পিছনে লেখা একটি বাক্য হয়ত আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, সেখানে লেখা রয়েছে, "মানুষের বিবেকই হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদালত।"

সুতরাং বুদ্ধিকে শুদ্ধি করে ঠিক কাজটি করুন আর সেই বিবেক আদালতের মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা উদ্ঘাটন করুন সত্য কোন পথে। এ কাজে আত্মার সাথে প্রবঞ্চনা করে মিথ্যার সাথে সন্ধি করবেন না। বরং পার্থিব সকল বন্ধনের জিঞ্জির ছিড়ে পবিত্রতার আঙ্গিনায় এসে সসাহসে শ্লোগান দিন, "সবার উপরে ঈমান সত্য তাহার উপরে নাই।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "যেসব লোক সর্বদা আমার উপদেশ শ্রবণ করিবেন প্রিয় খোদা তাহাদেরকে হেদায়াত দান করিবেন এবং তাহাদের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিবেন" (পুস্তক তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, পৃঃ ৯৪)। তিনি (আ.) আরো বলেন, "হে লোক সকল! ইসলাম বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। শত্রুরা ইহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অসংখ্য ধরনের আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে।

এইরূপ আপত্তির সংখ্যা তিন হাজারের কম হইবে না, তাই তোমার সাহায্যের দ্বারা তোমার ঈমানের পরিচয় দাও।" (পুস্তক বারাকাতুদ দোয়া, পৃঃ ৪৬) "বর্তমানে পুণঃ আল্লাহ্‌র করুণা ও কৃপা জান্নাত হইতে নামিয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। উঠ পরীক্ষা কর ও বিচার কর। তোমরা যদি দেখ যে, যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করিতেছেন, তিনি সাধারণ স্তরের লোক, সাধারণ বুদ্ধি রাখেন, সাধারণ কথাবার্তা বলেন, তাহা হইলে তাকে গ্রহণ করিও না।

কিন্তু যদি তাহার মাঝে অসাধারণ কিছু দেখ, যদি আশ্চর্যজনক কিছু পাও, যদি আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ও শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহার মাঝেও সেই জ্যোতিঃ ও চমক দেখিতে পাও, কেবল তখনই, হ্যাঁ, কেবলমাত্র তখনই তাহাকে গ্রহণ কর।" (পুস্তক ঐ পৃঃ ২৭)।

হে বন্ধু! আমার এই পত্রে আপনাকে অসাধারণ এক সত্যের সংবাদ দিলাম। জানি নাই শুনি নাই এহেন অজুহাতে সে সত্যকে যেন আর এড়িয়ে চলবেন না। বিচলিত বেকারার হয়ে পক্ষপাতহীন চিত্তে এ সত্যকে বিবেচনা করুন, ইহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এ পথে আপনি আপনার অভীষ্ট স্বর্গের সন্ধান পাবেন, সত্যকে বুঝুন, সত্যকে খুঁজুন এবং সত্যের পূজক হউন।

২২-২৪ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাজ্যের ৪৫তম জলসা সালানা সফল হোক

পবিত্র মাহে রমযানের পূর্ব প্রস্তুতি

মাহমুদ আহমদ সুমন

আর ক'দিন পরেই পবিত্র মাহে রমযান শুরু হচ্ছে। যে মাসের অপেক্ষায় সমগ্র বিশ্বের মুমি'ন মুত্তাকীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকেন। তারা ভাবতে থাকেন কবে আবার পবিত্র রমযান মাস পাব আর ইবাদত বন্দেগীতে আরো অগ্রগামী হব। রমযান মাস অত্যন্ত বরকত মণ্ডিত মাস। এ মাসের কল্যাণ বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। এই মহা বরকত ও কল্যাণের মাস রমযানে আর ক'দিন পরেই আমরা প্রবেশ করবো, ইনশাআল্লাহ। মহা পবিত্র এই রমযান মাসকে বরণ করার জন্য আমাদের সবার প্রস্তুতিও নেয়া উচিৎ। আমরা সাধারণত দেখি যে, কোন বিশেষ দিন বা কোন অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েক দিন এমন কি কয়েক মাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকি যাতে সফল ভাবে অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। আর সবচেয়ে বরকত ও কল্যানের মাস আমাদের সামনে সমাগত তাকে গ্রহণ করার জন্য কি আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আমাদের সবাইকে এর জন্য এখন থেকেই সম্পূর্ণভাবে তৈরি হতে হবে।

আমরা সবাই জানি, পবিত্র মাহে রমযানে অনেক বেশি নফল ইবাদত করতে হয়। আর রমযানে নফল ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। নফল ইবাদতের মধ্যে তারাবীর নামায অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। রমযান মাস এলেই রোযার সাথে সাথে যে ইবাদতটির নাম সর্বাগ্রে আসে তা হল তারাবীর নামায। তারাবি শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্রাম, আরাম। তারাবির নামাযে চাঁর রাকত নামায পড়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়া হয় তাই পরিভাষাগত ভাবে এ নামাযকে তারাবির নামায বলা হয়। তারাবির নামায আসলে তাহজ্জুদ নামাযেরই আরেকটি নাম। কিন্তু রমযান মাসে সর্ব সাধারণ যেন এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে এ জন্য সাধারণ মানুষকে রাতের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ইশার নামাযের পরপরই এ নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগেও এ নামায তেমন প্রচলিত ছিল না। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে এ নামাযটি সর্বাধিক প্রচলন পায় এবং তিনিই এর বর্তমান অবকাঠামোর প্রবর্তক। আর তখন থেকেই তারাবির নামাযে কুরআন করীম পাঠ করে শোনানোর প্রথা চালু হয়। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমের সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লেখ রয়েছে যে 'আর তুমি রাতের বেলা এ কুরআন পাঠের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ পড়'। আসলে তারাবির নামাযটিকে তাহাজ্জুদ নামায নামেই আখ্যায়িত করেছে। অন্যান্য হাদীসেও নবী করীম (সা.)-এর রাতের নামাযকে তাহাজ্জুদ নামাযই বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযানে কিয়াম (অর্থাৎ তারাবির নামায আদায়) করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

হাদীসে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন- রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হল মুহাররম মাসের রোযা আর ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায (মুসলিম)। বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমেই খোদা তাআলার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। নফল ইবাদতের ফলে আল্লাহ্ বান্দাকে তাঁর বন্ধু বানিয়ে নেন, যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে 'আর যখন আমি তাকে আমার বন্ধু বানিয়ে নেই তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে প্রার্থনা করলে অবশ্যই আমি তাকে দেই এবং সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দেই (বুখারী)।

হাদীসে নফল ইবাদত সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রভূ প্রতিপালক যিনি সকল কল্যাণের মালিক এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তিনি প্রতি রাতে এমন সময় পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন যখন রাতে এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকে আর বলেন, কে আমাকে ডাকে যেন আমি তার ডাকে সাড়া দেই, কে আমার কাছে প্রার্থনা করে যেন আমি তাকে দান করি এবং কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। (বুখারী)

আমাদেরকে এখন থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে যে, এবারের পুরো রমযানের তারাবীর নামায আমি বাজামাত আদায় করবো। আর এই নিয়্যত নিয়ে যদি খোদার কাছে দোয়া করি তাহলে খোদা তাআলা অবশ্যই এই ব্যবস্থা করে দিবেন। এছাড়া গত বছরে যে সমস্ত নেকী থেকে বঞ্চিত ছিলাম এবার যেন কোন নেকী বাদ না যায় সে ব্যাপারেও এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। যেমন গত রমযানে যদি বেশি দান-খয়রাত না করে থাকি, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় না করে থাকি, পবিত্র কুরআন খতম যদি না করে থাকি, মসজিদে কুরআনের দারসে যদি কম এসে থাকি বা যেকোন নেকীর কাজ রয়েছে তাতে যদি ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে এখন থেকেই সংকল্প করতে হবে যে এই রমযানে আমাকে যদি আল্লাহ্ তাআলা সুস্থ রাখেন তাহলে অবশ্যই আমি সব কল্যাণকর কাজগুলো পূর্বের চেয়ে অনেকগুণে বেশি করবো। যারা অফিস-আদালতে চাকুরী করেন তারা এখন থেকে সময় ঠিক করতে হবে কখন কুরআন তেলোওয়াত করবেন, কখন নফল ইবাদত করবেন। আমরা যদি এখনই রমযানের জন্য একটি রুটিন তৈরী করে ফেলি তাহলে বেশ ভলো হয়।

জানি না আগামি রমযান পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে কিনা বা এই রমযানই সুস্থতার সাথে কাটাতে পারবো কি না। তাই আমরা সবাই যেন পবিত্র রমযান মাস লাভ করতে পারি এবং সুস্থতার সাথে পুরো মাস রোযা রাখতে পারি সেজন্য এখন থেকেই বেশি বেশি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা উচিৎ এবং পূর্বের দোষ-ত্রুটির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার বন্ধুত্ব ও তাঁর ভালবাসা পেতে চাই তাহলে আমাদের ইবাদতের মানকে আরো উন্নততর করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র মাহে রমযান লাভ করার এবং এর থেকে কল্যাণ হাসিল করার তৌফিক দান করুণ, আমীন। ■

masumon83@yahoo.com

সদাচার একটি মহৎগুণ

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ইসলাম এমন একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল মানুষের প্রতি সুসম্পর্ক ও সৎ ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। মানুষের সাথে ভাল আচরণ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র হুকুম রয়েছে। সূরা হুজুরাতের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন" অর্থাৎ মু'মিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। মু'মিনগণ পরস্পর ভাই হবার সুবাদে একে অপরের সাথে সদাচার করবে, নিজেদের মাঝে ঝগড়াঝাটি, মারামারি ইত্যাদি করা হতে বিরত থাকবে, মহান আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, "ওয়া আহ্‌সিন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা" অর্থাৎ এবং সদয় আচরণ কর যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমার সাথে সদয় আচরণ করেছেন।" (সূরা কাসাস : ৭৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না, তিনি (সা.) বুকের দিকে ইশারা করে তিন বার বললেন, তাক্‌ওয়া এখানে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, "এবং সদয় ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে এবং নিকটাত্মীয়, এতিম, অভাবী আত্মীয়, প্রতিবেশী অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, সঙ্গী সহচর, পথচারী, ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের সাথেও (সদয় ব্যবহার কর) নিশ্চয় অহংকারী ও দাম্ভিককে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা : ৩৭) পবিত্র কুরআন একজন মুসলমানকে তার দয়াদাক্ষিণ্যের পরিধিকে সব মানুষের মাঝে বিস্তৃতি দানের ও প্রসারিত করার তাগিদ দেয়, নিকটতম আত্মীয় হতে দূরতম অজানা ব্যক্তিও যেন তার দয়া দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত না হয়। এছাড়া এ আয়াতে অধিকারভুক্ত বলতে দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও নিম্ন পদস্থ অধীনস্থ কর্মচারীকে বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে সদাচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "একজন মু'মিন তাঁর উত্তম আচরণের দ্বারা সেই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে, যে সারাদিন রোযা রেখে সারা রাত্রি ইবাদতে কাটায়।" (আবুদাউদ)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "জানা দরকার আখলাক দুই প্রকার। প্রথমত সেই আখলাক যা দ্বারা মানুষ গর্হিত আচরণ হতে নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় ঐ সকল নৈতিক গুণ যদ্বারা মানুষ কল্যাণকর আচরণে সক্ষম হয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট ত্যাগ অর্থে ঐ সকল আখলাককে বুঝায় যদ্বারা মানুষ চেষ্টা করে যেন তার জিহ্বা, তার হাত, তার চক্ষু বা তার অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্যের সম্পদ সম্মান বা প্রাণের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, কিংবা কোন অনিষ্টের বা মানহানীর ইচ্ছা না হয়।" (ইসলামী নীতিদর্শন)

প্রতিবেশীর সাথে সদব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের কোন প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা না দেয়া, তাদের উপকার করা, গরীব প্রতিবেশীকে দান করা এবং অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেওয়া প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। প্রতিবেশী, যে কোন ধর্মের যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আদর্শের অনুসারীই হউক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ ব্যবহারের প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মু'মিনকে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৃত বান্দাদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ আচরণ ঈমানদারগণের ঈমানের দাবী। পৃথিবীর মানুষ জন্মসূত্রে ও বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের আত্মীয়। মাতা-পিতার হক আদায়ের পর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সদভাব বজায় রাখা ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। ইসলামী জীবন বিধানে আত্মীয়তার হক আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এ যুগের মহাপুরুষ ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাঁর রচিত পুস্তক ইসলামী নীতিদর্শনে বলেন, "আমি যখন পবিত্র কালাম নিয়ে চিন্তা করি এবং দেখতে পাই যে, কি প্রকারে তিনি তাঁর শিক্ষায় মানুষকে তাঁর নৈতিক অবস্থা সংস্কারের বিধান প্রদান করে তাকে ক্রমশ: উর্ধ্ব দিকে আকর্ষণ করেছে এবং তাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছেন তখন এই জ্ঞানগর্ভ বিধান দেখে আমার মনে হয় যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ চেয়েছেন মানুষকে উঠা-বসা, পানাহার, কথা-বার্তা এবং সামাজিক জীবনযাপনের সর্বপ্রকার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে তাকে অসভ্য আচরণ হতে মুক্তি দান করেন। এবং পক্ষসদৃশ অবস্থা হতে সম্পপূর্ণরূপে আলাদা করে নিয়ে নিম্ন পর্যায়ের এক নৈতিক অবস্থা শিক্ষা দেন যা আদব ও শিষ্টাচার নামে অভিহিত হবার উপযোগী। তারপর মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসকে অন্য কথা যাকে নিম্নস্তরের চরিত্র বলা যেতে পারে, সুষ্ঠু অবস্থায় আনেন যাতে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসামঞ্জস্য হয়ে উন্নত চরিত্রে রূপপরিগ্রহ করে।" হযরত হারেসা বিন ওহাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যার আখলাক ভাল নয় এবং যে কটু কথা বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। " (আবু দাউদ, বায়হাকী) আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে কথায় ও আচরণে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা উচিত। তাহলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

মহান আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, আর তোমার চলাফেরায় মধ্য পন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর স্বর হলো গাধার স্বর।" (সূরা লোকমান : ২০) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন, এবং তোমরা লোকদের সাথে সুন্দর ও উত্তম কথা বলবে (সূরা বাকারা : ৮৪) সুধী পাঠক! নম্রতা ও বিনয় সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরছি তাহলে বুঝতে পারবেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে কি ধরনের আচরন করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌ নম্র এবং তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ভালবাসেন। (বুখারী)হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "নম্রতা সব কিছুকে সুশোভিত করে এবং তার অনুপস্থিতি সবকিছুকে ত্রুটিযুক্ত করে। (মুসলিম) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রা.) বর্ণনা করেছেন, "যার ভিতর নম্রতার অভাব আছে তার ভিতর সকল উত্তম জিনিসের অভাব আছে।" (মুসলীম)

এ যুগের মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "চতুর্থ প্রকার অকল্যাণ বর্জনের মধ্যে নম্রতা ও সদালাপ হলো অন্যতম। এই নৈতিক গুণ যে স্বভাবজ অবস্থা হতে সৃষ্টি হয় তাকে বলে 'তালাকাত' অর্থাৎ প্রফুল্লচিত্ততা। শিশু যতদিন কথা বলতে পারে না ততদিন সে নম্রতা ও উত্তম বাক্যের স্থলে প্রফুল্লচিত্ততা প্রদর্শন করে। এটাই এ কথার প্রমাণ যে নম্রতার মূল, যেখান হতে এই বৃক্ষ জন্মে তা 'তালাকাত'। তালাকাত (প্রফুল্লচিত্ততা) একটি শক্তি এবং নম্রতা একটি গুণ, যা এই শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহার সৃষ্টি হয়।" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

আজ পৃথিবীতে যে অশান্তি, খুন খারাপি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বিরাজ করছে তার মূলে হচ্ছে মানুষ নিজেদের স্বভাব চরিত্রে পশুসূলভ আচরণ করছে। মারামারি, কাটাকাটি, অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি অসামাজিক ও অশান্তিমূলক কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে শুধুমাত্র নম্রতা ও বিনয়ের অভাবে। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব দেখা দিয়েছে, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ হতে দূরে সরে পড়েছে। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য এবং ঐশী মহাপুরুষকে মান্যকারী হিসাবে এই ধরনের আচরণ হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা উচিত। সর্বদা আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সুন্দর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা জারী রাখা উচিত। তাহলে একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। তবেই আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রকৃত মু'মিন বান্দা হিসাবে গ্রহণীয় হব, আমীন। ■

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১ম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

বুযুর্গদের আবির্ভাব

প্রেমময় ও মমতাময় আল্লাহ্ তাআলা যখনই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের করাল কবলে পতিত দিশেহারা মানুষের পথের দিশায় তাঁর নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তখন তাঁর একত্ববাদের বাণীর ঝান্ডা সমাজে প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য যোগ্য শিষ্যও সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা কেউ কেউ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জীবদ্দশায় তাঁর দর্শন ও শিষ্যত্ব গ্রহণে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে সমাজে বিস্তার করে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। আবার অনেকে আবির্ভূত মামুরের ওফাতের পর তাঁর জারীকৃত সিলসিলায় দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ঐশীবাণী প্রচারে জীবনোৎসর্গ করে খোদা তাআলার নৈকট্য লাভে স্মরণীয় হয়েছেন। ফলে শ্রীকৃষ্ণ (আ.)-এর গোপীরা (শিষ্য) কৃষ্ণের বাঁশীর সুমধুর সুর (ওহী ইলহাম); হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা (অনুচর) তাঁর ঐশীমন্ত্র এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর উম্মতের ধর্মের সেবকরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সমাজে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

হাইউল কাইউম অর্থাৎ চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী খোদা তাআলার এই চিরন্তন বিধানের প্রতিফলনে বর্তমান শেষ যুগে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আহমদীয়া জামা'তের মাঝে অনুরূপ বহুসংখ্যক ধর্মের সেবক সৃষ্টি হয়েছে এবং এর প্রবাহমান ধারা অব্যাহত আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার–'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো' (ইলহাম) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ধর্মের এই সিপাহসালাহ সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে এমন অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি আছেন যাদের ওপর ওহী ইলহাম নাযেল হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তোমাকে ঐ সকল লোকে সাহায্য করবে, যাদের প্রতি আমি আকাশ থেকে ওহী নাযিল করি' (ইলহাম)।

শতবর্ষ ধরে আহমদীয়াতের আকাশে এমন অসংখ্য তারকারাজীর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আমরণ ধর্মের সেবায় নিরলস পরিশ্রম করেছেন। অনেকে খিলাফতের ডাকে জীবনোৎসর্গ করে দেশ বিদেশে আলোকিত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এসব তারকারাজীর মাঝে বাংলার বুকেও অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির জন্ম হয়। তাদের মধ্যে এক অনন্য বীর বাঙালি খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী। তিনি জার্মান বিজয়ী প্রথম মিশনারী ও মোবাল্লেগ। আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার আকাশে উদিত উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বরিত এক অনির্বাণ তারকা।

কলম্বাস আমেরিকা নামক দেশের পরিচয় প্রকাশ করে যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন, ভেনজিং ও হিলারী প্রথম এভারেষ্ট চূড়ায় আরোহণ করে যেমন এভারেষ্ট বিজয় করেছেন; তেমনি বলা যায়, সোনার বাংলার সোনার মানুষ মোবারক আলী প্রথম জার্মানবাসীর হৃদয়ে আহমদীয়াতের বীজ বপনে জার্মান বিজয় করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীনতম ঐতিহাসিক জেলা বগুড়া। এ জেলায় বহুমুখী মেধার প্রতিভাবান অনেক জ্ঞানী-গুণী ও সৃজনশীল মানুষের জন্ম হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সিপাহসালাহ, দেশ পরিচালনায় রাষ্ট্রপতি, শিক্ষকতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব, দেশবরণ্য কবি-সাহিত্যিক, রাষ্ট্রীয় সেবায় বিশেষ ব্যক্তি এবং ধর্ম সেবায় জীবনোৎসর্গকারী আশেকে রাসূলসহ ইতিহাস সৃষ্টিকারী অনেক আলোকিত মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন। বগুড়া জেলার বাইরেরও অনেকে বাল্যকাল থেকে বগুড়ার মাটি ও মানুষের সাথে মিশে বগুড়া শহরের স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে দেশ বিদেশে বরণ্য হয়েছেন। উভয়ের ক্ষেত্রে বগুড়াবাসীর নিকট যাঁদের নাম কিংবদন্তি হয়ে আছেন এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন তাদের মধ্যে ক'জন হলেন–রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ, ভাষাসৈনিক এডভোকেট গাজিউল হক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমদ, বিজ্ঞান গবেষক ও সাহিত্যিক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ ডঃ এনামুল হক, সার্কের মহাসচিব কিউ এ, এম, এ রহিম এবং মানুষ গড়ার উত্তম কারিগর খান সাহেব মোবারক আলী। তবে মোবারক আলী সাহেব একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ধর্মজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক মহানায়ক। বিদেশের বুকে ইসলাম প্রচারে এক লড়াকু সেনাপতি।

বগুড়া জেলার গাবতলী থানার অন্তর্গত দিগদাইড় গ্রামে তিনি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মোতাবেক ১২৮৮ বঙ্গাব্দের পৌষ কিংবা মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আরজউদ্দিন আহমদ। তাঁরা চার ভাই ও চার

বোন ছিলেন। ভাইয়েরা হলেন–(১) আকবর আলী, (২) মোবারক আলী, (৩) বেলায়েত আলী এবং (৪) কুরবান আলী। আকবর আলী লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান জনাব তবারক আলী বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বোর্ডের সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার আমীর হিসেবে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। বেলায়েত আলী ১৯১৪ সালে কাদিয়ানে বয়আত করেন। কিছুকাল তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ানে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি এফএ বর্তমান আই এস সি প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ডাক্তার হবার আশায় কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে কোলকাতায় বসন্ত রোগের মহামারীতে ক্যাম্বেল হাসপাতালে মারা যান। কোলকাতা শহরের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। কুরবান আলী বালক বয়সে বগুড়ায় ইন্তেকাল করেন।

তাঁর বোনদের মধ্যে এক বোনের বিয়ে হয় সোনারায় গ্রামের মুন্সী জাকের মোহাম্মদের ছেলে একরাম আলীর সাথে। একরাম আলী, তাঁর স্ত্রী, পিতামাতা এবং তার আরও তিন ভাই ১৯১৪ সালে মোবারক আলীর সাথে কাদিয়ান থেকে তবলীগি সফরে আগত হযরত হাফেজ রৌশন আলীর (রা.)-এর হাতে তাদের নিজ বাড়িতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। মোবারক আলীর অপর এক বোন আয়েশা বেগম তাঁর মাতাসহ ১৯১৪ সালে দিগদাইড় গ্রামে তাদের বাড়িতে হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত হাফেজ রৌশন আলী (রা.)-কে নিজ হাতে বয়আত গ্রহণের অধিকার দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুফি মতিউর রহমান যিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকার মিশনারী ছিলেন তাঁর সাথে আয়েশা বেগমের বিয়ে হয়। কিন্তু এ ধর্মপ্রাণ মহিলা বসন্ত রোগের মহামারীতে ১৯১৯ সালে তাঁর আশেক হোসেন নামে এক পুত্র সন্তানসহ অকালে মারা যান।

মোবারক আলী সাহেবের বড় পিতা অর্থাৎ তার দাদার পিতা হাজী জামালউদ্দিনের বড় জোতদারী ছিল। ধার্মিক ও সমাজের প্রথিতযশা মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বহুদূর প্রসারিত। তাঁর সন্তান অর্থাৎ মোবারক আলীর দাদাও ছিলেন অলীআল্লাহ্ মানুষ। ধর্মের সেবায় তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করতেন। তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। তখন উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে পাঞ্জাবে শিখদের সাথে মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণা হয়। বঙ্গদেশ থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান এ জেহাদে যোগ দেন। অনেকের ধারণা তিনি জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে রণাঙ্গনে শহীদ হন।

তখন তাঁর সন্তান অর্থাৎ মোবারক আলীর পিতা আরজউদ্দিন আহমদ মায়ের গর্ভে ছিলেন। ফলে তিনি জন্মের পর আর পিতার মুখ দেখেননি। কিন্তু পিতার ধর্মীয় শিক্ষার আদর্শ শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাঁর পিতার দুই স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। তাঁর এক মামা অর্থাৎ মোবারক আলীর দাদীর ভাই মওলানা মুন্সী মেহেরুল্লাহ মন্ডল একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি বড় বড় মাহফিলে ওয়াজ নসিহত করতেন। তাঁর নিজ গ্রাম বাইগুনি ছাড়াও এতদাঞ্চলের অনেক গ্রাম জুড়ে তার সুপরিচিতি ও খ্যাতি ছিল। ফলে মোবারক আলী সাহেবের ধমনীতে আল্লাহ্‌র অলী বুযুর্গ ব্যক্তিদের রক্ত প্রবাহিত হয়। ধর্মসেবায় আত্মোৎসর্গকারী তেজোদীপ্ত মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ ছিল তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণার হাতিয়ার। তাই তিনি শৈশব থেকে ধর্মীয় পরিবেশে বড় হন। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার আলোকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন।

শৈশব ও বাল্যকালে তিনি তাঁর দাদীর অধিক আদর সোহাগ পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- 'দাদী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ছোট বেলায় তাঁর সাথে রাতে থাকতাম। দাদীর সাথে তার বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতাম। শীতের সময় তার ঘরে আগুন পোহাইতে বেশি ভাল লাগতো। খুঁটাতে ভাল আগুন হয়। তাই আমি দাদির জন্য মাঠ হতে খুঁটা কুড়াইয়ে আনতাম। রোযার শেষ রাতে সেহেরী খাবার সময় তিনি আমাকে খাওয়াতেন। তখন দাদী বাড়ির চারদিকে কার্পাস ও এরন্ড গাছ লাগাতেন। এন্ডি ও কার্পাসের সূতা কাটতেন। রেন্ডির তেলের বাতি জ্বালানো হতো। তখন কেরোসিন তেল দেশে আসে নাই। সুতা কেটে অর্ধেক দ্বারা কাপড় বুনাইতেন এবং বাকী অর্ধেক সুতা তাঁতী বা জোলাকে মজুরী স্বরূপ দিতেন। তখন বিলাতী কাপড়ের বেশি প্রচলন হয় নাই। শীতকালে আমরা মোটা সুতির চাদর ব্যবহার করতাম। তা ধুতি অপেক্ষা বেশি মোটা নয়' (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ আগষ্ট ১৯৬৫)। এ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে তিনি অভিভাবকদের অধিক আদর যত্নের মাঝে শিষ্টাচার ও নৈতিকতা ও ধর্মীয় তালিম তরবিয়তসহ জাগতিক শিক্ষায় মানুষ হন।

শিক্ষা জীবন

মোবারক আলী সাহেবের পিতা আরজউদ্দিন আহমদ সে যুগের উচ্চশিক্ষিত না হলেও লেখাপড়া জানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাঝে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত ছিল। সে সুবাদেই তিনি আওনিয়া তাইড় গ্রামের মুন্সী বাড়িতে গোমস্তার চাকুরি করতেন এবং নিজ ছেলেদের উচ্চশিক্ষায় দেশবরণ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর বুকভরা আশা-আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা ছিল। বিশেষত: তাঁর চাচাতো ভাই ফজলুর রহমান ওরফে ফয়েজউদ্দিন মোক্তার তাদের বংশের ছেলেদেরকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে তাদের বাড়ির অনেক ছেলে লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হন।

আরজউদ্দিন আহমদ তাঁর বড় ছেলে আকবর আলীকে কর্পুর মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। দ্বিতীয় ছেলে মোবারক আলীর যখন মায়ের আঁচল ছেড়ে স্কুলে যাবার সময় হয় তখন তাকে গ্রামের রেফায়েত উল্লাহ্‌র পাঠশালায় ভর্তি করেন। এ স্কুলেই তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি। পরে তাঁকে বড় ভাইয়ের অধ্যয়নরত কর্পুর মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মোবারক আলী সাহেব বলেন–'গ্রামে রেফায়েত উল্লাহ্ চাচার একটি পাঠশালা ছিল। আমি প্রথম ক খ এবং ধারাপাত সেখানে পড়তাম। মাটিতে বড় বড় করে লিখতাম। তারপর তাল পাতায় লিখতাম। এরপর আমি বড় ভাইয়ের সাথে কর্পুর মধ্য বাংলা স্কুলে যাই। সেখানে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হই। বার্ষিক পরীক্ষার পর ৪র্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পাই'। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট ১৯৬৫)।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী ও বিনয়ী। ধর্মীয় অনুরাগ ছিল তাঁর প্রবল। গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল প্রশংসিত। সকলের আশীষ লাভে তিনি নন্দিত ছিলেন। সুবোধ বালক মোবারক আলীকে মোক্তার চাচা তাঁর ছেলে না থাকার কারণে বেশি স্নেহ করতেন এবং নিজ সন্তানের মত দেখতেন। তাই তিনি তাঁর স্নেহভাজন ভাতিজাকে বগুড়া শহরে নিজ বাসায় নিয়ে আসেন এবং বগুড়া বাংলা স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর তাঁকে বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। ১৮৫৩ সালে স্থাপিত এ জেলা স্কুল শুরু থেকেই খ্যাতি লাভ করে আসছে। স্কুলের স্মৃতিচারণে মোবারক আলী সাহেব বলেন–"বগুড়া জেলা স্কুলে ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সালে যখন পড়ি তখন হরেন্দ্র বাবু (হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী) ছিলেন হেড মাষ্টার। দীর্ঘাকৃতির এই মানুষটিকে দেখে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই খুব ভয় করতেন।

অভিভাবকরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ছাত্রদের চাল-চলন, পড়াশুনা কড়া নজরে দেখতেন। শিক্ষকরা ক্লাসে কি করছেন তা বাহির থেকে চুপি চুপি করে দেখতেন ও শুনতেন। নিয়মানুবর্তিতায় ও পরিশ্রমে তিনি সকলের আদর্শ ছিলেন। গণিত ও ইংরেজি প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্কুলের লাইব্রেরিতে যে সকল কিতাব ছিল প্রায় সবগুলিই তিনি পড়েছিলেন।

এই কড়া মানুষটির হৃদয় খুব সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। এই বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তিনি প্রভেদ করতেন না। আমার সহপাঠী মোজাম্মেল হকের পিতা শরাফত তরফদার ছিলেন গরীব মোক্তার। একবার স্কুলে মোজাম্মেলের ফিস বাকী পড়ে, জরিমানা হচ্ছে, কিন্তু তবুও ফিস দিতে পারছে না। হেড মাষ্টার মশায় মোজাম্মেলকে অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন–'মোজাম্মেল তুমি ফিস দিচ্ছ না কেন? তোমার ফাইন যে বেড়ে যাচ্ছে।' মোজাম্মেল লজ্জায় কথা বলতে পারল না। তার চোখে পানি আসে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হরেন্দ্র বাবু বললেন 'যাও'। তিনি নিজ পকেট হতে মোজাম্মেলের ফিস ও জরিমানা দিয়ে দিলেন।

ইংরেজি কোন শব্দের অর্থ বা উচ্চারণ নিশ্চিতভাবে না জানলে তিনি অম্লান বদনে বলতেন– এটা এখন জানি না, তোমাদেরকে পরে বলে দিবো। তিনি বলতেন, না জেনে জানার ভান করা একটি ভন্ডামী। এতে অনেক সময় লজ্জাও পেতে হয়। আমরা তাঁর এই গুণের প্রশংসা করতাম।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট ১৯৬৫)।

সেকালে কোলকাতা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে কোলকাতায় এন্ট্রান্স (বর্তমান এস,এস,সি) পরীক্ষা দিতে হতো। মোবারক আলী ১৯০০ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সে বছর বগুড়া জেলা স্কুল থেকে সাত জন পরিক্ষার্থী ছিল। বগুড়া সান্তাহার রেললাইন তখন চালু হয়। তিনি প্রথম ট্রেনে চড়েন এবং বগুড়া থেকে সান্তাহার হয়ে সহপাঠীদের সাথে কোলকাতা যান। ভাল পরীক্ষা দেন। ফলে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশের গৌরব অর্জন করেন। এতে আত্মীয় স্বজন অত্যন্ত আনন্দিত হন। নিজ গ্রাম ছাড়াও নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামের লোকজন এ কৃর্তিমান ছাত্রকে দলবেধে দেখতে আসেন। মোবারক আলীকে সকলেই আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় দোয়া করেন। কেননা, সেকালে মুসলমান ছেলেদের এন্ট্রান্স পাশ, উপরন্তু প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তি বিরল ঘটনা ছিল।

অত:পর তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিগন্তকে সমুজ্জ্বল করে গড়ে তোলতে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজে এফএ (বর্তমান আইএ) শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিছুদিন পরে কোলকাতা মাদ্রাসায় এফএ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃর্তিমান সাফল্যের জন্য কোলকাতা মাদ্রাসা থেকে 'আমীরে কবীর' নামে মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। তখন কোলকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের এফএ ক্লাস একই সাথে হতো এবং একই শিক্ষক পড়াতেন। পড়ার বিষয়ের ভিন্নতায় ক্লাস ভিন্ন হতো। তখন মাদ্রাসার ছাত্রদের বেতন ছিল মাসিক দুই টাকা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের মাসিক বেতন ছিল বার টাকা। তিনি মাদ্রাসা থেকে এফএ পাশ করেন এবং একনিষ্ঠ সাধনায় উচ্চ শিক্ষার ক্রমধারায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে বি এ পাশ করেন। তিনি ছিলেন বগুড়া জেলার তৃতীয় গ্র্যাজুয়েট। তখন তিনি মির্যাপুর মহল্লার ২১নং বুদ্ধ ওস্তাগার লেইনে, পরে ইলিয়ট হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছেন।

বাল্যকাল থেকে অজানাকে জানার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল। নিয়মিত বইপড়া ও গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। তাই স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর আলীঘর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভে তাঁর আকাঙ্খা হয়। সমাজে হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃত হয়ে যাওয়া সত্য ইতিহাস উদ্ঘাটন এবং তার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা জন্মে। কিন্তু বাধ সাধে তাঁর মোক্তার চাচা। তিনি 'ল' পাশ করে প্রখ্যাত আইনজীবি কিংবা সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হবার উপদেশ দেন। মোক্তার চাচা পিতৃতুল্য স্নেহ করতেন। উপরন্তু তাঁর অভিভাবকত্বে তিনি লেখাপড়া করেন। তাই চাচার উপদেশ পালনে কোলকাতা সিটি 'ল' কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আইনশাস্ত্রের পড়ার প্রতি তাঁর অনিহা জন্মে। তাঁর ভাষায়–

"বি এ পাশ করে কোলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শি ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ হাই স্কুলে মাস্টারী করতাম, আর 'ল' পড়তাম। ওকালতী ব্যবসা আমার পছন্দ হতো না। তবুও 'ল' লেকচারে এ্যাটেন্টও করতাম, চাচার আগ্রহের জন্য। কিন্তু চাচার নিজের মোক্তারী জীবন দেখে আইন ব্যবসার প্রতি আমার অভক্তি জন্মেছিল। 'ল' ক্লাসে দেখতাম প্রায় ছাত্রই প্রক্সি দিয়ে উপস্থিত লেখায়। আইন ব্যবসা যারা করবে তারা কলেজ থেকেই মিথ্যা আচরণ অভ্যাস করছে দেখে এ ব্যবসার প্রতি আমার ঘৃণা জন্মে।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট, ১৯৬৫)। কিন্তু তারপরও অভিভাবকদের উপদেশানুসারে 'ল'-পড়া ঢিলে তালে চালিয়ে যান। ১৯০৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কোলকাতায় বি এল প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাল প্রস্তুতি ছাড়া পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয়নি। অবশেষে আইন শাস্ত্রের পড়া ছেড়ে দেন। (চলবে)

বের হয়েছে! বের হয়েছে !!

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত অত্যন্ত মূল্যবান বই 'দাফেউল বালা' (বালা মুসিবত প্রতিরোধক) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

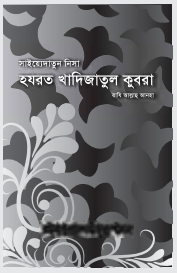

২। মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

৩। আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব রচিত 'কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি জগতপতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

সবকটি বই আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি আপনার কপিটি দ্রুত সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
আহমদীয়া লাইব্রেরী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল নং : ০১৭৩৬১২৪৭০৪

স্মৃতির পাতা থেকে-

জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A

(২য় কিস্তি)

তিনি নীরব, তার মুখের দিকে তাকালাম। কথাটা তাকে স্পর্শ করেছে, মনকে নাড়া দিয়েছে ভীষণ ভাবে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টে, নীরবে-সামনের দেয়ালের দিকে। সম্বিত ফিরে এলে আমার দিকে তাকালেন। চশমা চোখ হতে নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে পিয়নকে ডেকে চা আনতে বললেন। তারপর আমাকে বললেন, "ফরিদ ভাই, চলুন আমরা ভুলে যাই আমরা দুজন এখন এ সময়ে কে বা কি চলুন আমরা দু ভাই এর মত কথা বলি।" "বহুত মেহেরবাণী আপনার" আমি বললাম। চা খেতে খেতে আমাদের আলাপ প্রায় ঘন্টা খানেকের মত চলল। আমাদের দু'জনের কেউই কোন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করিনি। কথাবার্তা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন ও ধর্মীয় আচার-আচরণ বিধি ইত্যাদি নিয়ে। ইতিমধ্যে আমি Sponsor এর লাইন খালি রেখে Visa দরখাস্ত ফরম পূরণ সম্পন্ন করে পাসপোর্ট, কাগজপত্র, ৬০ টাকা ভিসা ফিসহ উনার হাতে তুলে দিলাম। Sponsor এর খালি লাইনগুলোতে নিজ হাতে উনি লিখলেন Ghulam Rabbani, son of : Chowdhury Ghulam Rasul, Presently Minister Embassy of Pakistan, Dhaka, Bangladesh, তারপর Visa Stamp লাগিয়ে দস্তখত করার পর আমার হাতে ফেরৎ দিতে দিতে বললেন, "জলসায় আপনার দোয়ার মাঝে আমাদের স্মরণ রাখবেন, ফরিদ ভাই এই আবেদন।" ওনাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাবার জন্য হাত বাড়াতেই তিনি হাত ধরে বললেন, "ফরিদ ভাই, পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে চট্টগ্রামের পথে ঢাকা ত্যাগ এর পূর্বে অবশ্য অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যাবেন। আচ্ছালামু আলাইকুম।"

ঐ দিন ছিল ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ, এমবেসী থেকে সোজা বকশী বাজার আমীর সাহেবের সাথে দেখা করে উনাকে আদ্যোপান্ত কাহিনী শুনালাম এবং আমীর সাহেবের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও দোয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। আমীর সাহেব ও মওলানা সাদেক সাহেব যারপর নাই খুশী হলেন এবং আমার জন্য ও রব্বানী সাহেবের জন্য দোয়া করলেন। আমীর সাহেব জানালেন যে তিনি পরদিন অর্থাৎ ২০ তারিখ সকাল বেলা পাকিস্তান রওয়ানা হতে যাচ্ছেন এবং আমার জন্য করাচীতে অপেক্ষা করবেন যাতে আমি ২২ তারিখ করাচী পৌঁছে ২৩ তারিখ বিকালের ট্রেনে করাচী কাফেলার সাথে রাবওয়ার পথে রওয়ানা দিতে পারি। আমীর সাহেবের কামরা থেকে বের হতেই পাক্ষিক আহমদীর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সাহেবের সাথে দেখা। আমীর সাহেবের সাথে জলসায় রাবওয়া যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে উনার জন্য একটা তফসীর এ সগীর (আরবী-ইংরেজী) আনার জন্য অনুরোধ করলেন।

এর পরপরই বাস যোগে আমি চট্টগ্রাম রওয়ানা দেই। যখন ঘরে পৌঁছি তখন রাত প্রায় ১২টা বাজে। পরদিন অফিসে যেতেই দেখি ডেনিশ জাহাজ নির্মাতার দুজন প্রতিনিধি এসে গেছেন। আমার বিভাগীয় প্রধান ক্যাপটেন কামাল ওদেরকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন যে তারা গতকাল থেকে অপেক্ষা করে বসে আছেন এবং যেহেতু পরদিন সকালেই আমি করাচীর পথে ঢাকা রওয়ানা দিতে যাচ্ছি তাই আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ দিনের ভেতরই চুক্তিপত্রের কাগজগুলি তৈয়ার করে ছুটির পূর্বেই বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত ঐ জাহাজ নির্মাণের work order এদের হাতে দিতে পারি। সকাল ১০টার দিকে টেলিফোন পেয়ে আগ্রাবাদ এলাকায় BCCI ব্যাংকের লবীতে জাফর সাহেবের সাথে দেখা করি। (জাফর আমার স্ত্রীর ছোট ভাই) জাফর সাহেব প্রথম কিস্তিতে একটি ১০০ ডলার এর নোট আমার হাতে দিল। পরপর আরও তিনটি নোট মোট ৩৫ ডলার অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ১৩৫ ডলার আমাকে দিল। আমি পকেট থেকে এক হাজার টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম। সে টাকাগুলি হাতে নিল। তারপর ফেরৎ দিয়ে বলল, "ফরিদ ভাই, টাকাগুলি আপনার হাতেই রাখেন।" আমি বললাম এত অনেক টাকা। অত টাকা তো আমার লাগবে না পাকিস্তানে। "ফরিদ ভাই, আপনি যাচ্ছেন পাকিস্তান সফরে জলসায় একটা ভাল কাজের উদ্দেশ্যে। তাই এই ডলার আমার পক্ষ থেকে উপহার, বিশেষত: আপনি জানেন না বিদেশ বিভুঁয়ে কত বেশী বেশী খরচ হতে পারে"।

অফিসে ফিরে এসে জাহাজ নির্মাণ চুক্তিপত্র ও নির্মাণ এর work order ইত্যাদি কাগজপত্র তৈরী করে উভয় পক্ষের দস্তখত সই শেষ করতে করতেই বিকাল ৩টা বেজে গেল। ডেনিশ ভদ্রলোক দুজনই আমাকে তাদের সাথে সন্ধ্যা বেলা ডিনারের দাওয়াত দিল, আমি অপারগতা জানালাম, বললাম যেহেতু করাচীর পথে ২২ তারিখ বিমান ধরতে পরদিন ভোরের ট্রেনে আমাকে ঢাকা রওয়ানা দিতে হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাতের মধ্যেই আমাকে বিদেশে দীর্ঘ সফরের জন্য বাক্সপত্র গুছিয়ে রেডী থাকতে হচ্ছে। তখন তারা আমাকে ঐ সময়েই তাদের সাথে একটা (Quick lunch) কুইক লাঞ্চ খাওয়ার অনুরোধ জানাল। হোটেল আগ্রাবাদ রেষ্টুরেন্টে খাওয়া পর্ব শেষ করে যখন উঠতে যাচ্ছিলাম তখন ডেনিশ দলের নেতা হেনরিক লারসেন আমার হাত ধরে বলল : "মি: ফরিদ, তোমার কাজ দেখে আমরা খুবই প্রীত হয়েছি। একদিনের ভিতরই যে আমাদের কাজ সম্পন্ন হবে এটা আমরা আশা করিনি। কেপটেন কামাল থেকে শুনলাম আগামীকাল সকালের ট্রেনে তুমি Vacation-এ অর্থাৎ ছুটি কাটাতে পাকিস্তান সফরে যাচ্ছ, আমরা এসেছি জাহাজ নির্মাণ চুক্তিপত্র সই করতে। বেশি টাকা পয়সা সাথে আনিনি। সফরে খরচের জন্য এই সামান্য উপহার গ্রহণ করলে খুব খুশী হব।" এই বলে একটা ১০০ ডলার এর নোট আমার হাতে গুঁজে দিল।

"দেখ জলসার পথে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য" সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে এই বলে তার হাতে, প্রথম দিলাম ১৩৫ ডলার, তারপর দিলাম ১০০ ডলার তারপর দিলাম ১০০০ টাকা। "এখন দেখ, এটাই হলো নুসরতে ইলাহী। জলসা সালানা উপলক্ষে রাবওয়া যাওয়ার জন্য ১৩৫ ডলার দিয়েছে তোমার ভাই জাফর, আর ১০০ ডলার দিয়েছে ডেনিশ পার্টি। আমি কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি যে এদের হাত থেকে এই টাকাগুলি আসবে।"

অতীব আনন্দিত হয়ে স্ত্রী বলল, "আলহামদুলিল্লাহ্। তাহলে এই ১৩৫ ডলার তোমার রাবওয়া জলসার খরচ, আর এই ১০০ ডলার আমার জন্য আগামী বছর কাদিয়ান যাওয়ার জলসার খরচ আর এই ১০০০ টাকার পুরোটাই ঢাকা জলসার জন্য 'মুখাইয়ার' একাউন্টে দিয়ে দাও।"

ডিসেম্বর ২২ তারিখ বেলা ১১টার দিকে বিমানের ফ্লাইটে করাচী পৌঁছে যাই। করাচী আমার পরিচিত শহর। প্রথম চাকুরী করাচী থেকেই শুরু। বেবীটেক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সদর এলাকায় জামা'ত অফিস, দেখি করাচী জামা'তের আমীর মোহতরম চৌধুরী মুখতার আহমদ সাহেব এর সাথে বসে আছেন আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব। কুশল বিনিময় ও দুপুরের খাওয়ার পর উপদেশ মোতাবেক এক খোদ্দাম ভাইকে, যে ট্রেন পরদিন বিকেল তিনটার সময় করাচী ক্যানটনমেন্ট থেকে রাওয়ানা দিবে ঐ ট্রেনে কাফেলার সাথে ফয়সালাবাদ পর্যন্ত যাওয়ার ট্রেনভাড়া বাবত পাকিস্তানী ৯০ রূপী দিলাম। পরদিন সকাল বেলা চা নাস্তার পর জামা'তের অফিসে বসেছি, এমন সময় চৌধুরী সাহেব দুজনই করাচী জামা'তের মেহমান হিসেবে জলসা সফর করবেন।" একটু সময় পরে এক খোদ্দাম এসে আমাকে ৯০ রূপী ফেরৎ দিয়ে গেল। সামান্য একটু আপত্তি জানিয়ে আমি বললাম "আমীর সাহেব বহুত মেহেরবাণী আপনার, এটার কি প্রয়োজন ছিল?" তিনি উত্তর দিলেন, "ফরিদ সাহেব, আপনি এবং আপনার আমীর সাহেব দুজনই এ জামা'তের মেহমান আর আমি এই জামা'তের আমীর।" আমি কথাটা বুঝে নিলাম এবং বললাম, "মাফ চাই আমীর সাহেব"।

কাফেলা যাত্রীদের জন্য ট্রেনের ৪টা পুরোবগী ভাড়া করা হয়েছিল। আমীর সাহেব ও আমাকে একটা বগীর সুন্দর নির্বিবাদ কোণায় জায়গা দেওয়া হয়েছিল। আমীর সাহেবের বোধ হয় একপায়ে কিছু অসুবিধা ছিল যার দরুন তিনি উঁচু-নিচু বা কংকর মন্ডিত ভূমিতে চলাফেরা করতে কষ্ট বোধ করতেন। রাতের প্রায় ৮টা বাজে বাইরে শীতের অন্ধকার, আমরা যখন কোটরী জংশনে পৌঁছি, দেখি আমাদের ট্রেন অনেক পেছনে, প্লাটফর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে। জানা গেল যে ষ্টেশনে আর একটি ট্রেন নিয়ে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে ওটা পরিষ্কার হতে প্রায় দুঘন্টা সময় লাগতে পারে। কিছুক্ষণ পরে এক খোদ্দাম এসে জানাল যে আমার ও আমার আমীর সাহেবের জন্য করাচী জামা'ত এয়ারকন্ডিশন্ড চেয়ার কোচে ২টি সিটের এনতেজাম করেছে। তিনি আমাকে ও আমীর সাহেবকে মালপত্রসহ বিশেষভাবে সাহায্য করে এই অন্ধকার শীতের রাতের মধ্যে নিয়ে এয়ারকন্ডিশন্ড বগীর সীটে বসিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্ এই পথে রেল ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার আছে, আল্লাহ্ তাআলার অপার শুকরিয়া যে আমরা দুজন সিন্ধ এলাকার মরুভূমির ধূলাবালু এবং পাঞ্জাব এলাকার ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতের প্রকোপ থেকে বেঁচে গেলাম! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

জলসা খুবই জাঁকজমক হয়েছিল। প্রায় দু'লক্ষ লোকের সমাবেশ নারী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, ছেলে-মেয়ে, বড়-ছোট সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দুজনকে অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে ষ্টেজেই আসন দেওয়া হয়েছিল। মওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব তখন রাবওয়ার জামেয়ার ছাত্র, বড় চটপটে ও স্মার্ট তিনি আমাদের যথেষ্ট খেদমত করেছিলেন। আমাদের খাওয়া, থাকা, চলা ফেরার সবদিকের সুবন্দোবস্তের দিকে নজর রেখেছিলেন। উনার খেদমত সব সময় মনে থাকবে, জাজাকুমুল্লাহ্। রাবওয়ায় যে ক'দিন ছিলাম উঠায় বসায়, খাওয়া পড়ায় সবদিকে নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, নীরব সুন্দর শান্তিময় পরিবেশ লক্ষ্য করলাম। তিন দিন ধরে জলসাতে 'মানবজীবনে বিভিন্ন ইসলামী বিধানের সম্পর্ক ও প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণি বক্তার বিভিন্ন বক্তৃতা ছাড়া ধর্মের নামে অন্য কোন কাজ কারবার–যেমন যিকর, আজকার, ফকিরী, ওরশ হু-হা বেহেশ্‌ত, দোযখ ওরকম কিছুই কোন খানে নাই।' তার বদলে ওখানে দেখি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, (জামেয়া), লাইব্রেরী, হাসপাতাল। আর বেহেশ্‌তী মাকবেরা একটি সুরক্ষিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কবরস্থান মাত্র, 'নন মুসলিম' হওয়ার জন্য ১৯৭৪ইং সনে এই জামা'তে বয়আত নেওয়ার আগে কাদিয়ানী বা মির্জায়ীদের সম্বন্ধে যে সব কল্পকাহিনী ও মিথ্যার বেশাতি শুনতাম ওসব কোন কিছুই আমার নজরে আসেনি। অত্যাশ্চর্যের মধ্যে ছিল তিনটি বিরাট বাস্তবতা যেগুলি মুখালেফদের চোখে কখনো কল্পনায় পড়েনি। প্রথমটাই হলো নবনির্মিত মসজিদ আকছা এর উত্তর পশ্চিম দিকের টিলার উপর একটি সুপেয় পানির ঝরণা। রাবওয়া এলাকায় একমাত্র ওটাই মিঠা পানির চাহিদা মেটায়। বাকী সব কুঁয়ায় লবনাক্ত পানি। আবে জমজমের মতই আল্লাহ্ তাআলার রহমতের নিদর্শনই বলতে হবে। দ্বিতীয় হল এক ঘন্টা সময়ের ভেতরই এতগুলো লোকের দুপুরের খাওয়া আর ওযু করা শেষে জলসাগাহে নামাযে যোগ দেওয়া। তৃতীয়টি হল এতগুলো লোকের মধ্যে কেউ কোনখানে প্রকাশ্যে বিড়িসিগারেট খায়না এবং কোন বিড়ি-সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্যের দোকান নেই।

দ্বিতীয় দিনের জলসা সমাপ্তির পরে বিকেলে গেষ্ট হাউসে আমার কামড়ায় ফিরে এসে দেখি সালোয়ার কোর্তা পড়া শাল গায়ে এক পাঞ্জাবী যুবক : জিয়াউর রহমান সাহেব, ছোট্ট একটা চিরকুট নিয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। আমার রুমমেট উনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমাকে আহমদীয়াতের প্রথম দিকে প্রথম দিগদর্শনকারী মরহুম মরগুব আলম সাহেবের মোহতরমা বেগম সাহেবা আমাকে উনাদের বাসায় লাহোর নিয়ে যাওয়ার জন্য জিয়া সাহেবকে পাঠিয়েছেন। জলসা শেষে আরও দুদিন অবস্থান করে আমি লাহোরে চলে গেলাম। উনারা বহু দিন পরে আমাকে পেয়ে বড় খুশী। অনেক দ্রষ্টব্যস্থান আমাকে নিয়ে দেখাল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাহেবজাদা মিয়া মান্নান সাহেবের বাসায় নিয়ে গেল। তারপর উনাদের হেডকোয়ার্টার লাহোরে নিয়ে উনাদের আমীর মোহতরম মওলানা ছদরুদ্দীন সাহেবের ঘরে নিয়ে গেল। ওখানে ৫ দিন ছিলাম। বিদায়ের সময় আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সার্টের কাপড়, শাড়ী, শালাওয়ার কামিজ, স্যুটের কাপড় ও ছয়টি ইংরেজী/উর্দু বই দিল, দুটো ছিল বেশ বড় বড় উর্দু বই মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিত বয়আন উল কুরআন। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে ঢাকায় বিমান থেকে নেমেই দেশে ফিরে আসার খবর দিয়ে চট্টগ্রামে ফোন করি। স্ত্রী বলল, "ঢাকা ত্যাগ করার আগে তুমি অবশ্যই গোলাম রব্বানী সাহেব-এর সাথে দেখা করে আসবে।"

শনিবার সকালে উনার সাথে দেখা করতে, এমবেসী অফিসে গেলাম। উনার কামড়ায় ঢুকে আচ্ছালামু আলাইকুম দিতেই উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। চেয়ারে বসার পর পাকিস্তানে আমার পরিভ্রমণের দিনগুলি বিশেষত: জলসার দিনগুলি কেমন কাটল জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অন্যান্য বিষয়সহ লাহোরে আলম সাহেবের পরিবারের কথা, তোহফা এবং করাচীর আমীর সাহেব সম্বন্ধে জানালাম। কথায় কথায় গোলাম রব্বানী সাহেব বললেন, "আমি গত রাতে চিন্তা করছিলাম, আপনি জলসা থেকে ফিরে এসে হয়ত চিটাগাং চলে গেছেন। আবার ভাবলাম, না, তা কখানো হতে পারে না। আমার সাথে দেখা না করে যাবেনই না। তদুপরি এই মাত্র ২/৪ দিন আগে বোধ হয়, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার কোন এক ভাই আমাকে দুইটা বড় বড় বই উপহার দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ ঠিক দেখছেন আপনি, সেই ভাইটি আমি, খাকছার।" এই বলে একটি কাপড়ের থলে (তখনও এদেশে প্লাষ্টিক ব্যাগ জাতীয় কোন থলে চালু হয়নি বাজারে) উনার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, "এখানেই ঐ দুটো বই মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিত বয়ান উল কুরআন এবং এক প্যাকেট চিলগুজা বাদাম আছে।"

উনার সাথে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশী সময় ছিলাম না। সপ্তাহের প্রথম দিনের খোলা অফিস। অনেক লোকের ভীড়, ভিসা প্রার্থীও হতে পারে, কোলাকুলি বাদ উনাকে আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারপরে মনে ইচ্ছা থাকলেও সাংসারিক বাস্তবতা ও ব্যস্ততার কারণে ওদিকে যেতে পারিনি। তবে ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসে সস্ত্রীক জলসা সালানায় রাবওয়া যাবার উপলক্ষে যখন ভিসার জন্য আবার এমবেসীতে যাই, তখন খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, পদোন্নতি লাভ করে রাষ্ট্রদূত হয়ে উত্তর কোরিয়া চলে গেছেন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

মসজিদ মোবারক-এর উদ্বোধন ও কিছু কথা

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ১০/০৪/২০১১ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর হালকা সন্তোষপুরে সৈয়্যদেনা হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশ্‌শের-উর-রহমান এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী উথলীতে আগমন করেন।

ঐ দিন বেলা ১১টায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সন্তোষপুর হালকায় যান এবং নবনির্মিত মসজিদ "মসজিদ মোবারক"-এর শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে খাকসার কুরআন তেলাওয়াত করি এবং জনাব আমিনুজ্জামান বাংলা নযম পাঠ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন, "মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদের অবাদ এ দু'টো ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই আমরা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করে যেমনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করব, তেমনি তাঁর ঘরে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে এর হক আদায়ে সকলে সচেষ্ট হব।" তিনি আরো বলেন, এ জায়গাটির নামই হল সন্তোষপুর, অতএব, এ মসজিদে আগতরা, আহমদী/অ-আহমদীরা সকলেই যেন এখানে বা এ মসজিদে এসে সন্তোষ প্রকাশ করে।"

উল্লেখ্য যে, গত ২০১০ সালের আঞ্চলিক জলসা সালানা শৈলমারী জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়, তার পরের দিন উথলী জামা'তের সন্তোষপুর হালকায়, জনাব সাহাব উদ্দিন আহমদ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ এবং জনাব আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন।

মসজিদ নির্মাণের অর্থ মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী জনৈক ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করলে সেই ব্যক্তি অর্থ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

মসজিদ নির্মাণের শুরু থেকে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে এর তত্তাবধায়ন করেন ও মসজিদ নির্মাণ চলাকালে তিনি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল গফুর সাহেবকে মসজিদের কাজের অগ্রগতির খবরা-খবর প্রত্যেক সময়ে জানানোর জন্য আহ্বান করেন এবং জনাব আব্দুল গফুর সাহেবকে তিনি বলেছিলেন, "মসজিদ নির্মাণ কাজের জন্য কমপক্ষে দশ শতক জমি ওয়াক্‌ফ করে রেজিষ্ট্রি দলিল কেন্দ্রকে প্রদান করতে হবে, সে মোতাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেব তৎক্ষণাত তার নিজস্ব সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।

নায়েন ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্, জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান, সেই সময় জমি সংক্রান্ত বিষয়টির জন্য সন্তোষপুরে সফর করেন এবং পরামর্শ দেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর সন্তোষপুর হালকাতে মোট সদস্য সংখ্যা ৪৭ জন। জনাব আব্দুল গফুর সাহেব যে দশ শতক জমি ওয়াক্‌ফ করেন সেখানেই তাদের পূর্ব নির্মিত একটি বৈঠকখানাও জামা'তকে দান করেন এতে তাঁর বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উথলী, চুয়াডাঙ্গা, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া, সর্পরাজপুর, জামা'তসমূহ হতে প্রেসিডেন্ট সাহেবগণসহ বেশ কিছু মেহমানগণ উপস্থিত ছিলেন। মসজিদ উদ্বোধনে উক্ত জামা'তসমূহের বিভিন্ন হালকা ও পকেট, বিশেষত উথলী জামা'তের নতুন নতুন হালকা ও পকেট থেকে নও মোবাঈন এবং জেরে তবলীগ মেহমানগণ আগমন করেন। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরের খাবারের শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও স্থানীয় নেতৃবর্গ নতুন একটি হালকা (বর্তমানে শৈলমারী জামা'তের) শাহাপুর মসজিদের জমি পরিদর্শনের জন্য যান এবং সেখানেও ছোট্ট একটি বৈঠক সম্পন্ন করেন। সবশেষে দোয়া করেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদের নাম হুযূর (আই.)-এর দেয়া 'মসজিদ মোবারক' রাখা হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে বেশি বেশি মসজিদ মুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোয়াযযেম আহমদ সানী

সং বা দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

সিরাতুন নবী (সা.) জলসায় বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের উদ্যোগে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা শুক্রবার গত ০১/০৭/২০১১ বাদ জুমআ বায়তুল বাসেত, চকবাজার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৌশলী জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের সভাপতিত্বে উক্ত জলসায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নেছার আহমদ। মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তাঁর বক্তব্য বলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছেন কিভাবে সকল মানুষকে ভালোবাসতে হয়। তিনি সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপ করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ।

সিরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন উপলক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম তিনটি গ্রুপে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জলসায় শেষাংশে রচনা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সম্মাননাপত্র বিতরণ করা হয়।

পরিশেষে দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

খালিদ আহমেদ সিরাজী

কিশোরগঞ্জ জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৬/১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআর পর স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উপস্থিতির মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়।

উক্ত জলসায় বক্তৃতা করেন সর্বকালের উৎকৃষ্ট আদর্শ মহানবী (সা.)-এর উপর কেন্দ্র থেকে আগত জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান। মৌ. বশির আহমদ মানবতার সংকট ও এর উত্তরণে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এর উপর বক্তৃতা প্রদান করেন কেন্দ্র থেকে আগত জনাব আব্দুল জলিল। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

খুলনা রিজিওনাল মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সীরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ মে, ২০১১ খুলনা রিজিওনাল মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পরিচালনায় কেন্দ্রের নির্দেশনা মোতাবেক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুরবাগ মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন এর সভাপতিত্বে উক্ত জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. আজিজুল ইসলাম (রানা)। নযম পাঠ করে শুনান মুহাম্মদ জিহাদ হাসান। এরপরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এ বিষয়ের উপরে আলোচনা করেন যথাক্রমে মৌ. আজিজুল ইসলাম (রানা) এবং মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা খুরশীদ আলম। ওয়াকফে জিন্দেগী জনাব শামসুর রহমান খিলাফত একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। উপস্থিত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের রেকর্ড পরিবেশন করা হয়। সব শেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। এতে ৬৭ জন আহমদী এবং ৩৮ জন জেরে তবলীগ ভাই ও বোন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম মোশফিকুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৬/২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্বি করেন নাছিমা বশির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন শারমিন আক্তার মুনা। দোয়া পরিচালনা করেন নাছিমা বশির।

আহাদনামা পাঠ ও উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। নযম পরিবেশন করেন তানিয়া সামাদ। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন কুররাতুল আইন। বার্ষিক অর্থ বিবরণী রিপোর্ট উপস্থাপন করেন স্বপ্না মেহতাব। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির। মালী কুরবানী ও চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, রিনাত ফৌজিয়া। এতায়াতে নেযাম সম্পর্কে বলেন, নাফিয়া শারমিন। এরপর কুইজ ও নযম প্রতিযোগিতা নেয়া হয়।

দ্বিতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন ২-৩০ মিনিট থেকে ৫টে পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন রহিমা খাতুন। নযম পাঠ করেন শাওন, তানিয়া। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন স্বপ্না মেহতাব। এরপর লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. আবদুস সালাম, মোয়াল্লেম।

শহীদদের স্মরণে নযম পেশ করেন আমাতুস্‌সামী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান আফরোজা মতিন। এরপর লাজনা নাসেরাতদের তালিমী পরীক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে সভানেত্রীর সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার সমাপ্তি হয়। উক্ত ইজতেমায় ২৭০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

১৩তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন ২০১১-অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুন হতে ২৫ জুন, ২০১১ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১৩তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের 'বায়তুস সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। ২১ জুন সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ গোলাম রসূল এবং নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী।

সভাপতির নসিহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। অত:পর ওয়াকফে নও ও ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম ও স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরদার। ৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মলনে প্রতিদিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায থেকে শুরু করে রাত ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক তালিম তরবিয়তী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেন মওলানা খোরশেদ আলম মৌ. এস,এম, তৌহিদুল ইসলাম মৌ. আজিজুল ইসলাম মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। জনাব এস, এম,তারিকুল ইসলাম, সুন্দরবন জনাব জি, এম, সাব্বির আহমদ।

প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও ও উপস্থিত পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে তালিম তরবিয়ত বিষয়ক বিভিন্ন নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। ওয়াকফে নওদের তালিম ও তরবিয়তী ক্লাসের শেষে উপস্থিত ওয়াকফে নওদের মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনিমালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতা-মাতাদের মধ্যে দ্বীনিমালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ জুন, ২০১১ তারিখ বিকাল ৩টার সময় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারীর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রহিমা আফসানা, নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন এবং পিতা ও মাতাদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন জি, এম, রইছউজ্জামান ও মিসেস মুসলিমা আসলাম।

অত:পর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা খোরশেদ আলম, সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বাংলাদেশ ও স্থানীয় আমীর। অত:পর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত ওয়াকফে নও সম্মেলনে সুন্দরবন জামা'তের ৩২ জন ওয়াকফে নও, ২৮ জন ওয়াকফে নও পিতামাতা উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, রবিউল ইসলাম

দায়ী ইলাল্লাহ্ সভা-২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৭/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৪ ঘটিকায় মোবাল্লেগ ইনচার্জ বাংলাদেশ-এর নির্দেশক্রমে জাতীয় তবলীগ স্কীম বাস্তবায়নের লক্ষে প্রথম দায়ী ইলাল্লাহ্ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোসলে উদ্দীন, সহকারী ন্যাশনাল তবলীগ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হাসিবুল হাসান রতন (নায়েব ন্যাশনাল আমীর মিরপুর) সালাউদ্দিন মাহমুদ আহমদ, এনাম আহমদ, প্রেসিডেন্ট আজিমপুরসহ মোট ১৪ জন দায়ী ইলাল্লাহ্ উপস্থিত ছিলেন।

সালা উদ্দিন মাহমুদ

কৃতি ছাত্র

আমার একমাত্র ছোট ভাই আবরার মাসুদ সিরাজী পিতা-খালিদ আহমদ সিরাজী, চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য, সে **নাসিরাবাদ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়,** চট্টগ্রাম হতে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

খোদা তাআলা যেন তার সব নেক ইচ্ছা পূরণ করেন এবং তাকে খোদাভীরুতা, দয়া ও রহমতের চাদরে আবৃত্ত রাখেন সেজন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়া প্রার্থী
ফারিহা ফাইরুজ সিরাজী
আপন নিবাস, চট্টগ্রাম

শুভেচ্ছা

পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকার নব বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আমরা সকল পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

সম্পাদক

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লার একজন লাজনা সদস্যা মরহুম ডা: আবুল কাশেম-এর দ্বিতীয় স্ত্রী বি, বাড়ীয়া নিবাসী মরহুম কফিল উদ্দিন এর একমাত্র মেয়ে মোহতরমা হনুফা বেগম সাহেবা গত ২০/০৬/২০১১ রাত ৩ ঘটিকায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মরহুমা ব্যক্তিগত জীবনে একজন মোখলেছ পর্দানশীল মহিলা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নেক ফিতরত ও মেহমান নেওয়াজী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত স্বর্ণালংকার যার মূল্য ৫,৫০০০/- টাকা মসজিদে নূরে দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি ৫ ছেলে, ৫ মেয়ে এবং অনেক নাতি-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪/০৬/২০১১ বাদ জুমুআ ফতুল্লা মসজিদে মরহুমার যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ফজলে মরহুমার ছেলে মেয়েরা সবাই জামা'তী। আমরা মরহুমার রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমাকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম ও তার পরিবারবর্গকে সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য জামা'তের সবার নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগরের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা জনাব নাসির আহমদের স্ত্রী জনাবা মিলনা বেগম গত ২২/০৬/১১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২ টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মৃত্যুকালে মরহুমা স্বামী, ২ ছেলে, ২ মেয়েসহ নাতি-নাতনী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। স্থানীয় জামাতে জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমা ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন এবং নেক প্রকৃতির ছিলেন। জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন মরহুমার রূহের মাগফিরাতের জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমাকে বেহেশতের উচ্চ মোকাম ও তার পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারনের তৌফিক দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী – মরহুমার বড় ছেলে
রাফেজ আহমদ ভুলন

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: "আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	আগস্ট ২০১১ MTA বাংলা অনুষ্ঠান সূচী বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টা থেকে
১ আগস্ট, সোম URDV 417	* কুরআন করীম এর অপার সৌন্দর্য্য - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী * খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:) এর জীবনী- মাওলানা আক্রামুল ইসলাম, সঞ্চালক: মামুন উর রশিদ (পুণঃপ্রচার)
২ আগস্ট, মঙ্গল URDV 427	* রমজানে তারাবী ও নফল এবাদত- মাওলানা আক্রামুল ইসলাম, সঞ্চালক: সালাউদ্দিন আহমদ * রসুল করীম (সা:) এর জীবনাদর্শ- মাওলানা খোরশেদ আলম। (পুণঃপ্রচার)
৩ আগস্ট, বুধ URDV 428	* রমজানের গুরুত্ব- মালানা সালেহ আহমদ * তরবিয়তে আওলাদ- মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল জলিল। (পুণঃপ্রচার)
৬ আগস্ট, শনি URDV 485	* রমজানের মসলা-মাসায়েল - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * বিভিন্ন ধর্মে রোজার বিধান। (নতুন)
৮ আগস্ট, সোম URDV 486	* রমজানে কুরআন নাজিলের তাৎপর্য - মাওলানা বশিরুর রহমান; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজান বিষয়ক আলোচনা - লাজনা পরিবেশিত। (নতুন)
৯ আগস্ট, মঙ্গল URDV 487	* রমজান আত্মশুদ্ধির মাস - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজানের নান দিক নিয়ে আলোচনা- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। (নতুন)
১০ আগস্ট, বুধ URDV 488	* হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনে রমজান - মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজানে মালী কুরবানীর গুরুত্ব - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। (নতুন)
১৩ আগস্ট, শনি URDV 489	* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জীবনে রমজান - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজানের গুরুত্ব - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ। (নতুন)
১৫ আগস্ট, সোম URDV 490	* দরসে হাদীস- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * লাইলাতুল কদর এর প্রকৃত তাৎপর্য - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ। (নতুন)
১৬ আগস্ট, মঙ্গল URDV 491	* রমজানে নফল ইবাদত - মাওলানা জাফর আহমদ; * দোয়া কবুলিয়ত ও রমজান - মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। (নতুন)
১৭ আগস্ট, বুধ URDV 492	* রমজানের তিন দশক - মাওলানা জহির আহমদ; * রমজান বিষয়ক আলোচনা - লাজনা পরিবেশিত। (নতুন)
২০ আগস্ট, শনি URDV 493	* রমজানে এতেকাফের গুরুত্ব - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; * রমজানে দোয়া কবুলিয়ত - হাফেজ আবুল খায়ের। (নতুন)
২২ আগস্ট, সোম URDV 488	* হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনে রমজান - মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজানে মালী কুরবানীর গুরুত্ব - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।
২৩ আগস্ট, মঙ্গল URDV 489	* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জীবনে রমজান - মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজানের গুরুত্ব - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ। (পুণঃপ্রচার)
২৪ আগস্ট, বুধ URDV 486	* রমজানে কুরআন নাজিলের তাৎপর্য - মাওলানা বশিরুর রহমান; * নাত-ই-রসুল (সাঃ); * রমজান বিষয়ক আলোচনা - লাজনা পরিবেশিত। (পুণঃপ্রচার)
২৫ থেকে ২৯ আগস্ট,	"সত্যের সন্ধানে - ১১" (পুণঃপ্রচার)
৩০ আগস্ট, মঙ্গল	"ঈদ অনুষ্ঠান" পুনঃপ্রচার
৩১ আগস্ট, বুধ	**"ঈদ উল ফিতর" - এর বিশেষ অনুষ্ঠান (নতুন)**

বিঃদ্রঃ **প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা -** হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস (আইঃ) জুমুয়ার খুতবা সরাসরি সম্প্রচার খুতবার তার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান । **প্রতি বৃহঃস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টা -** হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার **প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা -** কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।

এমটিএ দেখুন, এমটিএ দেখাকে অভ্যাসে পরিণত করুন নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ

http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মুল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী , ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**

হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 1st Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15 July, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

তৃতীয় শাখা এখন **গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে**

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com